কাঠগড়ার মানুষ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

রাজশাহী ডিভিশনের অবসরপ্রাপ্ত

স্পেশাল জজ

মোঃ মুমিনূর রহমান

সেতু প্রকাশনী

১১৩ সেগুন বাগান, ঢাকা-২

Mamun Academy

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রূম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

Kathgarar Manush-2
A collection of important sensational cases.
Collected, edited and translated by
Md, Muminur Rahman, Spl. Judge (Retd.)

Mamun Academy

MD. ASHAK-UN-NABI
SHOJON
৩/৪-C LALMATIA

কাঠগড়ার মানুষ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মোঃ মুমিনূর রহমান

Mamun Academy

সূচী

ভূমিকা ৭

হতভাগিনী মাসিমা ৯
বৈরিণী আয়েশা ৩০
ট্রাঙ্ক রোডে খুন ৩৮
রেল লাইনের হত্যাকাণ্ড ৪৭
নাচোলের নৃশংস পুলিশ হত্যা ৫৯
লীলা ৭৭
মরণ-ফাঁদ ৮৯
রক্ষকই ভক্ষক ৯৮
কুসুমে কীট ১০৭
নাবালিকা স্ত্রীর হেফাজত ১১৮
হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ ১২৫
খ্রীস্টান ডাইভোর্স ১৩৯
রক্তাক্ত জলপ্রপাত ১৪৭
আইনের শাসন ১৬০
ডাকাত ১৭৩
আদালত অবমাননা ১৯০
জামাল হক হত্যা মামলা ২১২

Mamun Academy

ভূমিকা

'কাঠগড়ার মানুষ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই পাঠক সমাজে এ নিয়ে বিপুল সাড়া ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি। অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছেন এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড তাড়াতাড়ি প্রকাশের জন্য। তাঁদের আগ্রহে উৎসাহিত হয়েই দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হল। এই খণ্ডে দেশ বিদেশের ১৭টি চমকপ্রদ ঘটনাবহুল মামলা কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে, যার সবই সত্য ও বাস্তব। আশা করি প্রথম খণ্ডের মত এটিও পাঠক সমাজে আদৃত হবে আর সেই সঙ্গে আইনের শাসনের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সমর্থন বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যতে এর আরও একটি খণ্ড প্রকাশের আশা রইল।

বিখ্যাত কথাশিল্পী ও প্রকাশক কাজী আনোয়ার হোসেনের উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এত শীঘ্র এই খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হত না। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

জেলা জজ

যশোহর

মোঃ মুমিনুর রহমান

১৯/৮/৮২

হতভাগিনী নাসিমা

সুন্দরী তরুণী নাসিমা চৌধুরীর রহস্যজনক খুনের সংবাদে সেদিন লাহোরে তথা সমগ্র পাঞ্জাবে এক ভয়ঙ্কর আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। সেদিন দেখা গেল কে বা কারা সুন্দরী নাসিমাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে রেখে গেছে। ডাক্তারী পরীক্ষায় আরও প্রকাশ পেল যে মৃত্যুর আগে নাসিমা ছিল দুই সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। আরও জানা গেল যে বিষ প্রয়োগের ঠিক আগে বা পরে তাকে ধর্ষণও করা হয়েছিল।

কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করেছে এই প্রশ্নই সেদিন জাগল সবার মনে। কিন্তু কে দেবে তার সদুত্তর?

কাহিনীটি আরও আগে থেকে শুরু করা যাক:

নাসিমা চৌধুরীর পিতা-মাতা ছিল খৃষ্টান। অবস্থা তাদের সচ্ছল ছিল না। স্বাবলম্বী হবার জন্যে নাসিমা নার্সিং ট্রেনিং নিয়েছিল লাহোরে।

১৯৪৮ সালের কোন এক সময়ে লাহোরের এক ধনীর সন্তান আবদুল গনির সংগে পরিচয় হয় নাসিমার। সেই পরিচয় ক্রমে গভীর প্রেমে পরিণত হয়। উভয়ে উভয়ের জন্যে পাগল হয়ে ওঠে, একে অন্যকে তারা মন-প্রাণ সঁপে দেয়।

আবদুল গনির পিতা ছিলেন লাহোরের এক বিখ্যাত সিনেমা হলের মালিক। অর্থ ও বংশগৌরব সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ।

Mamun Academy

তার ইচ্ছা ছিল প্রিয় পুত্র আবদুল গনিকে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিলেত পাঠাবেন। তারপর ভাল বংশের কোন সুন্দরী মেয়ে দেখে ধুমধামের সংগে তার বিয়ে দেবেন।

কিন্তু বাপের আশায় ছাই দিয়ে গোপনে গোপনে চলল নাসিমা ও গনির প্রেমের খেলা। গনি জানত যে তার বাপ-মা এ বিয়েতে কোনদিনই রাজি হবে না। তাই তারা ঠিক করল যে উভয়ে গোপনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এই উদ্দেশ্যে নাসিমা খ্রীস্টধর্ম ত্যাগ করে একদিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তারপর আবদুল গনি পিতা-মাতার অজ্ঞাতে নাসিমাকে বিয়ে করল গোপনে।

নাসিমার বাপ মা-ও কিন্তু কন্যার ধর্মান্তর গ্রহণে মোটেই সায় দিতে পারেনি। তাই এর পর নাসিমা ও আবদুল গনি উভয়েই তাদের পিতা-মাতা থেকে দূরে সরে পড়ল। ফলে নাসিমা ও গনি ঠিক স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর জীবন যাপন করতে পারছিল না। কারও বাপ-মাই এই বিয়েতে সম্মতি না দেয়ায় তারা হয়ে পড়েছিল নিজ নিজ পরিবার ও সমাজ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু তা হলে কি হবে? দুজনেই তখন গভীর প্রেমে মশগুল। হোক না সমাজ, আত্মীয় স্বজন তাদের প্রতি বৈরী। কিন্তু উভয়েই যে আজ পেয়েছে নিজের মনের মত সাথী। এই ত তাদের জীবনে সবচেয়ে বড় সার্থকতা। দুজনেই তাই তখন মহা খুশি।

বিয়ের পর তারা লাহোরের ফিরোজপুর রোডে একটি বাড়ি ভাড়া নিল। মিসেস আলভী নামী এক ভদ্রমহিলা ছিলেন ওই বাড়ির মালিক। আর মিসেস আলভী নিজেও সেই বাড়ির অপর অংশেই থাকতেন।

সদ্য পরিণীতা নাসিমাকে নিয়ে থাকার জন্যেই আবদুল গনি এই বাড়ি ভাড়া নেয় বটে, কিন্তু আবদুল গনি প্রকাশ্যে এখানে এসে

Mamun Academy

থাকতে সাহস করত না। অবশ্য দিন ও রাতের অধিকাংশ সময়ই সে কাটাত এখানে নাসিমার সংসর্গে। বিশেষ করে দুপুরের খাবার সে এ বাড়িতে এসে নাসিমার সংগে একত্রে বসে খেত। আর নাসিমাও গনির আসতে একটু দেরি হলে চাতক পক্ষীর মত চেয়েথাকত পথের দিকে।

কিছুদিন পরে মিসেস আলভী ওই বাড়ি ছেড়ে তাঁর স্বামীর সংগে অন্যত্র উঠে গেলেন। আবদুল গনি তখন আর ওখানে অন্য ভাড়াটে আসতে না দিয়ে নিজেই পুরো বাড়িটাই মাসিক ১২৫-টাকা ভাড়ায় নিয়ে নিল তার ও নাসিমার জন্যে।

এই সময় তারা উভয়েই একটি সন্তান লাভের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু নাসিমার বাচ্চা হওয়ার কোন লক্ষণ না দেখে একদিন তাকে ভাল করে পরীক্ষার জন্যে আবদুল গনি তাকে স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে নিয়ে গেল। ভালভাবে তার পরীক্ষার জন্যে সেই হাসপাতালে তাকে ভর্তিও করে দেয়া হল। ১৯৪৯ সালের মে মাসে সেখানে নাসিমাকে একটি অপারেশনও করা হয় যাতে সে সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভ করতে পারে। হাসপাতালের রেজিস্টারে পরে (মামলার সময়ে) দেখা যায় যে সেখানে নাসিমাকে মিসেস আবদুল গনি চৌধুরী নামেই ভর্তি করা হয়েছিল।

সারাদিন চুপচাপ বসে থাকতে নাসিমার ভাল লাগে না। তাই ফিরোজপুর রোডের ওই বাসায় থাকা কালে, ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি কালে ডাক্তার মোহাম্মদ আলী নামক এক প্রাইভেট ডাক্তারের ক্লিনিকে সে নার্সের চাকরি গ্রহণ করে। এর পর থেকে প্রতিদিন সকালে আবদুল গনি তার নিজের গাড়ি নিয়ে নাসিমাকে ফিরোজপুর থেকে 'টাইগার পার্কে' ডাঃ মোহাম্মদ আলীর ক্লিনিকে পৌঁছে দিয়ে

পরে সে নিজের কর্মস্থলে চলে যেত। আবার বিকালে নাসিমাকে সে ওই ক্লিনিক থেকে বাসায় নিয়ে আসত ও দুজনে গভীর রাত পর্যন্ত সেই বাসায় কাটাত। এই ভাবে লাহোরে তাদের দুজনার দিনগুলো বেশ আনন্দেই কাটছিল।

এমন সময়ে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধানতঃ তার পিতার উদ্যোগেই আবদুল গনি লাহোর ছেড়ে বিলাত রওনা হল, পিতার ব্যবসায়ের ট্রেনিং-এর জন্যে।

এরপরই কিন্তু নাসিমা এখন বারের মত অর্থকষ্টে পড়ল। তার বাড়ি ভাড়াও অনেক বাকি পড়ে গেল। ফলে মুখরা বাড়িওয়ালী মিসেস আলভী বকেয়া ভাড়ার তাগাদায় এসে নাসিমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতে শুরু করলেন। গনির মায়ের কাছ থেকেও মিসেস আলভী একবার তার বাড়ির কিছু বকেয়া ভাড়া আদায় করলেন।

গনি লণ্ডনে থাকা কালীন তার প্রতিশ্রুত টাকা না পাওয়ায় নাসিমার পক্ষে অত ভাড়া দিয়ে সেই বাসায় থাকা আর সম্ভব হল না। অগত্যা ১৯৫৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ডাঃ মোহাম্মদ আলীর ক্লিনিক সংলগ্ন একটি ঘরে সে থাকার ব্যবস্থা করে নেয়। এই সময় থাকা-খাওয়া ছাড়াও ক্লিনিকে চাকরির জন্যে নাসিমাকে মাসিক ১০০ টাকা বেতন দেয়া হত। এই নতুন আশ্রয় পেয়ে নাসিমা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

১৯৫৩ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকেই গনি ইংলণ্ড থেকে আবার লাহোরে ফিরে এল। নাসিমা ভাবল এবার বুঝি তার দুঃখের রাত পোহাল। আবার নাসিমা-গনি আগের মতই স্বামী-স্ত্রী রূপে চলা-ফেরা করতে লাগল। তবে এবারও তারা আগের মত গোপনীয়তা রক্ষা করল।

নাসিমা ডাঃ মোহাম্মদ আলীর ক্লিনিকেই থাকতে লাগল। প্রতিদিন বিকালে গনি তার নিজ গাড়িতে ক্লিনিকে এসে নাসিমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। আবার ২/৩ ঘণ্টা পরে রাত্রে তাকে নিজে ক্লিনিকে রেখে যেত।

আবদুল গনির পিতার কানে ছেলের এই গোপন বিয়ের কাহিনী পৌঁছলেও, তিনি কিন্তু কখনও পুত্রের এই বিয়ে স্বীকার করে নেননি বা নাসিমাকেও পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করেননি। পিতা তাঁর শিক্ষিত পুত্রের এই অধঃপতনের জন্যে একমাত্র নাসিমাকেই দায়ী করতেন। আবার নাসিমাও গনির পিতাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ঘৃণা করত।

পিতা মনে করলেন, একটি ভাল মেয়ে দেখে ছেলে আবদুল গনির বিয়ে দিলেই তার মন নাসিমার মোহ থেকে মুক্ত হবে ও ক্রমে সে তাকে ত্যাগ করবে। এই আশায় মুলতানের একটি সদ্বংশজাত সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে তিনি আবদুল গনির বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। এমন কি দিন-তারিখও হয়ে গেল। ওই সালেরই ১১ডিসেম্বর সাড়ম্বরে এই বিয়ে হবে ঠিক হল। সবচেয়ে আশ্চর্য যে আবদুল গনিও সেই বিয়েতে মত দিল—যদিও সে নাসিমার সঙ্গে তার এতদিনের সম্পর্ক একেবারে ঘুচিয়ে ফেলতেও চাইছিল না। (এই বিয়ে যথা সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল, অবশ্য নাসিমার মৃত্যুর পরে।)

যতই বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসছিল, গনির মনও ততই অস্থির হয়ে উঠছিল। তার পিতা ত আরও চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। মুলতান ও লাহোরের মধ্যে দূরত্ব বেশি নয়। শেষ পর্যন্ত গনির সংগে নাসিমার গোপন সম্পর্কের কথা জানাজানি হয়ে গেলে নতুন এই সম্বন্ধ আবার ভেঙে না যায়, এই ছিল তাদের ভয়। আবার বিয়ের পর নাসিমার উপস্থিতিতে লাহোরে নতুন বউ নিয়ে আসতেও আবদুল

আজ আবার গনির বিরুদ্ধে আমার গুরুতর অভিযোগ আছে। যে গাড়িতে গনি আমাকে রোজ বেড়াতে নিয়ে যায় সেই গাড়িতে করেই গুণ্ডারা আজ আমার পেছনে লেগেছে। এটা হিংসা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবুও আমি ভয় পাই না।'

'১১ই নভেম্বর।

গনি, তুমি একটা আস্ত বোকা। তুমি আমাকে ভয় কর, কিন্তু তবুও তুমি আমার সংসর্গ কামনা কর। তুমি আমাকে ভয় দেখাও, আবার আমার কাছে এলে আমার ঘনিষ্ঠতা চাও। কিন্তু কেন? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না?'

'১৩ই নভেম্বর।

আজ আবার তোমার ও আমার মধ্যে ঝগড়া বাধল। তুমি কত বড় একজন প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক! ঠিক তোমার বাপের মতই হয়েছ তুমি! তোমার বাপ পাকিস্তান সরকারের চোখে ধুলা দেয়, আর তুমি ধুলা দাও আমার চোখে! আমি কিন্তু এই লাহোর শহ-রেই বসবাস করতে থাকব, এমন কি যদি আমাকে খুনও করা হয়। আবার আমি বদমায়েশদের কাছ থেকে ভয় দেখানো টেলিফোন কল পেয়েছি। কিন্তু তবুও আমি ভীতা নই।'

'১৪ই নভেম্বর।

গনি, কেন তুমি এমনভাবে আমার পেছনে লেগেছ? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি? তবে তোমার এইসব হুমকিতে আমি ভীতা নই।'

'১৫ই নভেম্বর।

কারও সঙ্গে আজ তুমি সারাদিন ফুর্তি করেছ! তোমাকে অভি-নন্দন জানাচ্ছি! কিন্তু আমাকে যদি আগামীকালও মরতে হয় তবুও

আমি তোমার সাক্ষাৎ কামনা করব। তুমি গনি, ঈদ মোহাম্মদ (তোমার পিতা) বা 'রতন সিনেমার' গুণ্ডারাও আমাকে ভীত করতে পারবে না। আজ পর্যন্ত আমি ভয় কাকে বলে জানি না। আমি এখানেই বাস করতে থাকব। তুমি ভেবেছ আমি বুঝি তোমার বিয়েতে কাঁটা হয়ে দাঁড়াব ? তবে হে আমার প্রিয়, কেন তুমি আগে থেকেই আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নাওনি ? এখন যে এত তাড়া-হুড়া, এসবের কি প্রয়োজন ছিল ?'

'১৬ই নভেম্বর।

আজ অবশ্যই আমি তোমার সংগে দেখা করব। আর তোমার মুখের ওপর তোমার কুকীর্তির সব কথা ফাঁস করে দেব। তুমি আমাকে গুলি করবে ? আমি বরং তাতে সুখীই হব। এর আগে তুমি আমাকে যে পিস্তলের গুলিটি পাঠিয়েছিলে তা এখনও এখানে আছে। আমি বরং তোমাকে বলব যে আমাকে হত্যার পরে তুমি পেশোয়ারে পালিয়ে যেও, বুঝেছ ? তোমার মনে পড়ে কি 'ইচহারা খুনের' কথা ? তোমার পিতা বুঝি টাকা দিয়ে পুলিশকে বাধ্য করবে ? মনে রেখো এটাই তোমার প্রতি আমার শেষ উপদেশ।'

'১৭ই নভেম্বর।

গতকাল বেশ মজা হয়েছিল। তোমার মুখেই তোমার মনের ছাপ ফুটে উঠেছিল। তুমি সব কথা শান্ত ভাবে শুনলে। কত কাপুরুষ তুমি ! আমি সাহস করে সব কথা তোমার মুখের ওপর বলতে পারলাম। আমি জানি, আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তুমি যা কিছু বলেছ তা সবই মিথ্যা। তোমার পিতার থেকেই তুমি মিথ্যা বলার তালিম নিয়েছ। তোমরা সবাই জন্ম থেকেই অতি হীন।'

'১৮ই নভেম্বর।

হাঁা, শেষ পর্যন্ত মিঃ গনি গতরাত্রে তার মুখ খুলেছে। (বলেছে) 'আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে যাচ্ছি কেবলমাত্র আমার পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে।' বেশ, তাই কর। আনন্দের সাথে কর। হে আমার প্রিয়, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবার আমি তোমার হাত থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু তুমি ত আমাকে মুক্তি দিতে চাও না। কারণ আমি যে তোমার জীবন, হৃদয় ও প্রিয়া! আমি কিন্তু তোমার আত্মীয়দের ও সেই সংগে তোমাকেও ধিক্কার দিই। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার পিতা অবশ্যই আমাকে মুক্তি দেবেন। আর আমিও তোমার আগেই আবার বিয়ে করব। তুমি আমাকে নিশ্চিন্তে বলি দিতে চাও তোমার পিতা-মাতার খামখেয়ালীর বেদীতে? আমি কিন্তু একটি বলি হতে কখনই রাজি নই।

'১৯শে নভেম্বর।

এই নাসির এক বিচিত্র লোক। কোনরকম ভূমিকা বা অনুষ্ঠান ছাড়াই সে আমার ওপরে চেপে বসতে চায়। আমার ইচ্ছা হয় এই সব লোকের প্রকৃত রূপ জানতে। ভয় হচ্ছে যে সে বোধহয় রতন সিনেমার লোক। তবে ক্রমে সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'২০শে নভেম্বর।

মিথ্যাবাদী! বেশ, যত নিষ্ঠুর তুমি হতে পার হও। আমি প্রতিবাদ করব না। আমার তরফ থেকে এই বলতে পারি যে আজই আমাদের দেখা-সাক্ষাতের শেষ দিন। এখন থেকে আর আমি তোমার সাক্ষাৎ কামনা করব না। কিন্তু তবুও যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তবে তা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। হ্যাঁ, সেই পিস্তলটি আমার কাছে আছে। এটা ফিরিয়ে দেব? সকালে এ সম্বন্ধে আরও চিন্তা করা যাবে।'

Mamun Academy

'২১শে নভেম্বর।

মিথ্যুক! আজ আবার সে ডিগবাজি খেলো। অজুহাত দিল কিনা গাড়ির! মনে হয় তুমি ভীত। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তোমার সংগে উচিত ব্যবহার করি যা তুমি কোনদিন ভুলতে না পার। কিন্তু হায়, আমি যে তা পারি না! একদিন তোমাকে যে আমি পূজা দিয়েছি। কেউ কি পারে তার প্রাণনাথের সংগে অসদ্ব্যবহার করতে? সেবিকাকেই অবশ্য তা সহ্য করতে ও তার ফল ভোগ করতে হবে।'

'২২ শে নভেম্বর।

অসৎ, বিশ্বাসঘাতক! কি নিষ্ঠুরভাবে তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ! বেশ, তোমার ইচ্ছাই জয়ী হবে। শেষ পর্যন্ত ডাঃ মোহাম্মদ আলীর ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রমাণিত হল। আজকের সন্ধ্যা কত বিপদজনকই না ছিল। মানুষ কি মানুষকে এভাবে কাঁদাতে পারে? যদি পৃথিবীতে প্রতিদানের সত্যিই ব্যবস্থা থেকে থাকে, তবে তা দেখার জন্যে আমি জীবন ভর প্রতীক্ষা করব। আমি আশা করি পৃথিবীও তোমাকে অনুরূপ শাস্তি দেবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমাকে ধ্বংস করবে।'

'২৪শে নভেম্বর।

তুমি এত বিচলিত হয়ে পড়েছ কেন? বুড়ো লোকটি (ডাঃ মোহাম্মদ আলী) দেখে ফেলেছে বলে? (না) বোধহয় তোমার তথাকথিত সম্মানের মুখোশ খসে পড়েছে বলে? ঈশ্বর তোমার ধ্বংস আনুক। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তুমি আমার জীবন-তরী ডুবিয়েছ, এখন তুমিও ডুবে মর।'

'২৬শে নভেম্বর।

গনি, কত নিষ্ঠুর তুমি ! এ সময়ে তুমি রক্তপাত ঘটাতে চাও ? আমি চিন্তাও করতে পারি না। তোমার বাপের আমি থোড়াই তোয়াক্কা করি। তার নামও আমার সামনে উচ্চারণ করো না।

দরগায় গিয়েছিলে ? কি লাভ তাতে ?'

'২৭শে নভেম্বর।

ডার্লিং গনি, তোমার যা খুশি কর। আমি ভীত নই। যদি আমাকে জ্বালাতন কর, তবে তোমার ও তোমার পরিবারের সম্মান হাওয়ায় উড়বে। আমি তোমার গুণ্ডাদের ভয় করি না। কিন্তু আমি কিছুতেই লাহোর ছাড়ব না। আমি বরং মৃত্যুবরণ করতেও রাজি। আর তোমার হাতে প্রাণ দিতে পারলে সেটা হবে আমার পরম সৌভাগ্য।'

'২৮শে নভেম্বর।

আজ ভাড়াটে গুণ্ডাদের কাছ থেকে টেলিফোন পেয়েছি। তারা জানিয়েছে যে যদি তাদের আমি আরও দু'হাজার টাকা দিই তবে তারা আর আমার পিছু লাগবে না। আর গনির পিতা যে-সব গোপন কথা তাদের বলেছে তাও তারা আমাকে বলে দেবে। কিন্তু কি লাভ ? একদিন অবশ্যই প্রত্যেককেই মরতে হবে। তার জন্যে চিন্তা কি ? এর পেছনে সময় ও অর্থ নষ্ট করে লাভ নেই। আমি কেবল কামনা করি গনি যেন মানুষের মত মানুষ হয়।'

'২৯শে নভেম্বর।

আবার সেই একই মিথ্যার আশ্রয়। তুমি বল এক আর কর আরেক। গনি, একেকবার আমার ইচ্ছে করে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক। কিন্তু পরক্ষণেই চাই, আমার শাপ যেন তোমার জন্যে বর হয়ে দাঁড়ায়।'

'৩০শে নভেম্বর।

Mamun Academy

হ্যাঁ, এবার দাঁড়িপাল্লা আমার দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। এবার যদি গনি তুমি আমাকে খুন কর তবে আমার ক্ষতি হবে না, কারণ আমার সঙ্গে তুমি তোমার নিজের রক্তও ক্ষয় করবে। আল্লারই বোধহয় এটা ইচ্ছা। নাহলে এত বৎসর পরে হঠাৎ এ হতে যাবে কেন ? আমি ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করব। আমি খুব কামনা করি যে, আমার ধারণাই যেন সত্য বলে প্রমাণিত হয়।'

'১লা ডিসেম্বর।

ডিসেম্বর মাস আবার ঘুরে এসেছে আমার জীবনে। ডিসেম্বরই আমার জীবনের সবচেয়ে অশুভ মাস। গত বৎসর এই মাসেই পেয়েছিলাম আমার জীবনের কঠিন আঘাত। গত এক বৎসর যাবত আমার দেহটা কেবল কোনরকমে বেঁচে আছে। দেখা যাক এই মাসেই এই দেহ কবরে যায় কিনা। না এই দেহ আরও কিছুকাল এভাবে টেনে হেঁচড়ে এগুবে ? দেখি কি হয়।

গনি কিন্তু সংবাদটি শুনে একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছে। আমি খুব হেসেছি মনে মনে।'

'২রা ডিসেম্বর।

ডাক্তারের মতে আমার ধারণাই ঠিক। এখন আমি তাদের গোটা পরিবারকে নাচাতে পারি। এবার আমি আমার যথাসাধ্য করব। তুমি আমার সব কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছ। তাতে আমার কি ক্ষতি ? এখনও আমার কাছে কয়েকটি চিঠি আছে। আর আছে সমস্ত পৃথিবী আমার সাক্ষী। লাহোরের প্রতিটি ধূলিকণাই সাক্ষ্য দেবে তোমার আর আমার মধ্যে কি সম্বন্ধ।'

'৩রা ডিসেম্বর।

খান (ডাঃ মোহাম্মদের বাবুর্চি শাহজাহান খান) পবিত্র পুস্তক দেখে

ভবিষ্যৎবাণী করেছে যে আমরা পরস্পর থেকে চির জীবনের মত বিচ্ছিন্ন হব। হায় ঈশ্বর, আমার কি হবে? তাকে ছাড়া আমি কি-ভাবে বাঁচব? খান আরও বলেছে যে গনির হাতে আমার জীবনের ভয় আছে। তাই আমি যেন আর তার সংগে দেখা না করি। কিন্তু না—। এ কখনও হতে পারে না। আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত আমি কখনও তার সঙ্গ ছাড়তে পারব না।'

'৪ঠা ডিসেম্বর।

এখন গনি আমাকে চাপ দিচ্ছে আমি যেন কোন ডাক্তার দেখাই। দুঃখের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে গেছি। এখন বরং তার সংগে সামনা-সামনি কথা বলাই ভাল।'

'৫ই ডিসেম্বর।

তুমি অনাগত বাচ্চা নিয়ে এত বিব্রত হয়ে পড়েছ? এটা ত আল্লার দান। তিনি যখন যাকে যা দিতে চান, তা ছাদ ফুটো হয়ে আকাশ থেকে নেমে আসে। তবুও ভাল যে আগামীকাল রোববার। তুমি যদি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ত্যাগ না কর, তবে আমি পুলিশে খবর দেব। যে বিপদই আসুক না কেন আমি দৃঢ়ভাবে তার মুখো-মুখী হয়ে দাঁড়াব। কিন্তু তুমি যা চাচ্ছ তা কখনই হবে না।

'৬ই ডিসেম্বর।

দুই-দুই বার তুমি এসে ফিরে গেলে। কোন উপায় ছিল না। আমি তোমার সংগে দেখা করিনি। কারণ তা করতে আমি বাধ্য হয়েছি। তোমার দিক থেকে আমি ভয়ানক বিপদের আশংকা করছি। তুমি চাও দুই-দুটি জীবন বিসর্জন করতে—তোমার পিতার মিথ্যা সম্মানের খাতিরে।'

ডায়েরীর পাতা এখানেই শেষ।

Mamun Academy

পরের রাত্রে হতভাগিনী নাসিমা আর বেঁচে ছিল না তার এই অসমাপ্ত ডায়েরী লেখার জন্যে। এতদিন যাবত তার মনে যে ভয় উঁকি মারছিল আর যে মহা-বিপদের আশঙ্কা সে প্রতি মুহূর্তেই করে আসছিল তাই ঘটল তার জীবনে ৭ই ডিসেম্বর। যে ডিসেম্বর ছিল তার জীবনের অপয়া মাস। এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হল সেদিন নাসিমা।

পরে কোর্টে আতা মোহাম্মদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়ঃ

৭ই ডিসেম্বর বিকাল প্রায় ছয়টার সময় অন্যান্য দিনের মতই আবদুল গনির মোটর গাড়ি এসে থামে ডাঃ মোহাম্মদ আলীর ক্লিনিকের সামনে। হর্ন শুনেই বেরিয়ে আসে নাসিমা। সেদিনও গনির আহ্বানে পরিপাটি হয়ে সেজে দ্বিধা জড়িত চিত্তে নাসিমা গিয়ে ওঠে তার গাড়িতে। আর সঙ্গে সঙ্গে গনি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলে যায় দূরে।

ওই দিনই প্রায় ঘণ্টা দুই পরে, সেই একই গাড়ি আবার এসে থামে ওই ক্লিনিকের সামনে। গাড়ি থেকে ঘন ঘন হর্নের আওয়াজ শুনে ডাঃ মোহাম্মদ আলীর দুজন চাকর—আতা মোহাম্মদ ও শাহজাহান এগিয়ে যায় গাড়ির দিকে। তারা দেখতে পায় গাড়ির যে-পাশে নাসিমা বসেছিল সেদিকের দরজা খোলা, ভেতরে নাসিমার অবস্থা যেন অস্বাভাবিক। উঁকি দিয়ে তারা দেখে যে অজ্ঞান অবস্থায় নাসিমা পিছনের সীটে পড়ে আছে। আবদুল গনি তাদেরকে এগিয়ে এসে নাসিমাকে ধরে গাড়ির বাইরে বের করে আনতে ও শিগগির ডাক্তার দেখাতে বলে। আতা ও শাহজাহান হতভম্ব অবস্থায় নাসিমাকে গাড়ি থেকে বের করে আনতে চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু নাসিমা তখন একেবারেই অজ্ঞান। তাই তার দেহ খুব ভারি মনে হচ্ছিল, দুজনের পক্ষে ধরাধরি করে বের করে আনা কষ্টকর

Mamun Academy

হয়। এই অবস্থায় ওরা যখন নাসিমার নিস্তেজ দেহ টানাটানি করে বাইরে আনবার চেষ্টা করছিল তখন আবদুল গনিও গাড়ির ভেতর থেকে নাসিমার নিঃসাড় দেহ দ্রুত ঠেলে বের করে দেয়। ফলে নাসিমার দেহ গড়িয়ে গাড়ি থেকে একেবারে মাটিতে পড়ে যায়। তার তার পর পরই আবদুল গনি হঠাৎ গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দ্রুত উধাও হয়ে যায়।

হতভম্ব আতা ও শাহজাহান ওরকম ভাবে নাসিমাকে ফেলে দিয়ে গনিকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে দেখে আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরই তারা নাসিমার দিকে নজর দেয়। নাসিমার অবস্থা অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় আতা মোহাম্মদ ডাঃ মোহাম্মদ আলীকে খবর দেবার জন্যে দৌড়ে যায়।

এরই মধ্যে ডাঃ মোহাম্মদ আলী ওপরের বারান্দা থেকে এই ঘটনা দেখতে পেয়ে দ্রুত নেমে আসেন নিচে। তাঁর ড্রাইভার আবদুল আজিজও দৌড়ে আসে সেখানে। সবাই মিলে ধরাধরি করে নাসিমার নিস্তেজ দেহ ক্লিনিকের ভেতরে নিয়ে আসে। সেখানে ডাক্তার নাসিমাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন ও ইনজেকশন দেন।

এরপর ডাঃ মোহাম্মদ আলীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়:

তিনি ভাল করে নাসিমাকে পরীক্ষা করে দেখেন যে সে একেবারেই অজ্ঞান। শরীরে তার কোন স্পন্দন নেই। হাত দিয়ে দেখলেন, গা ঠাণ্ডা। মনে হল মরফিয়া বিষক্রিয়ার ফল। তাড়াতাড়ি তাকে একটি কোরামিন ইনজেকশন দেয়া হয়। কিন্তু তবুও তার মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না—যদিও নাড়ির ক্ষীণ স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছিল। ইনজেকশনের পর নাড়ির অবস্থা উন্নতির দিকে মনে হল।

ঠিক এই সময় নাকি ডাক্তার মোহাম্মদ আলী আরেকজন সঙ্কটাপন্ন রোগীর কাছ থেকে টেলিফোন কল পেয়ে সেখানে চলে যান। আধঘন্টা পরে ফিরে এসে তিনি আবার নাসিমাকে পরীক্ষা করেন ও দেখতে পান যে নাসিমার নাড়ি আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তিনি তাড়াতাড়ি নাসিমাকে আরও একটি ইনজেকশন দেন। কিন্তু কোন উন্নতি না দেখে ডাক্তার তারপর তাঁর নিজের গাড়িতে করে নাসিমাকে নিয়ে যান 'মেয়ো হাসপাতালে'। রাত তখন প্রায় দশটা।

হাসপাতালে ডাঃ হুররাণী নাসিমাকে পরীক্ষা করে তাকে আবার একটি ইনজেকশন দেন। এর ১৫ মিনিট পরেই তিনি আবার নাসিমাকে পরীক্ষা করে দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে সে মৃত।

কিন্তু ডাক্তার হুররাণীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে রোগিনী মেয়ো হাসপাতালে আসার পথে বা হাসপাতালে পৌঁছেই মারা যায়। কারণ প্রথম পরীক্ষায়ই তিনি বুঝতে পারেন যে রোগীর দেহে প্রাণ নেই।

পরে পুলিশে খবর দেয়া হয় হাসপাতাল থেকেই। নাসিমার মৃতদেহের ময়না তদন্তে প্রকাশ পায় যে আর্সেনিক বিষ খাইয়েই তাকে হত্যা করা হয়েছে। আরও প্রকাশ পায় যে সেই দিনও কোন পুরুষ তার সঙ্গে সহবাস করেছে. অর্থাৎ তার যোনীপথে পুরুষের বীর্য পাওয়া গেছে।

পুলিশ যথারীতি তদন্তের পরে আসামী আবদুল গনির বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে বিষ খাইয়ে নাসিমাকে হত্যা করেছে।

তদন্তের সময়ে পুলিশ নাসিমার ঘরের ড্রয়ার থেকে তার এই মূল্যবান ডায়েরীটি উদ্ধার করে। নাসিমা সেটি নিজ হাতে সযত্নে লিখে

Mamun Academy

যাচ্ছিল মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত।

দায়রার বিচারে লাহোরের সেশন জজ আসামী আবদুল গনিকে খালাস দিয়ে তার রায়ে বলেন :

'সাক্ষ্য-প্রমাণে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে আসামী গনি ও নাসিমা ১৯৪৮ সাল থেকে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করে আসছিল। যদিও মনে হয় তাদের মধ্যে কোনদিন কোন বিয়ের অনুষ্ঠান হয়নি, যা দ্বারা তাদের সংসর্গকে বৈধ ছিল বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ আবদুল গনিই নাসিমার সম্পূর্ণ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করত। কিন্তু পরে গনি নাসিমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছিল প্রধানত দুটি কারণে ; তার পিতা-মাতার অনুরোধে ও মুলতানে তার পরবর্তী বিয়ে ঠিক হওয়ায়। কিন্তু তবুও এরকম ধারণা করার যথেষ্ট কারণ নেই যে গনি নাসিমাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল।

নাসিমার সঙ্গে গনির গোপন প্রেমের কথা প্রায় সবাই জানত, এমন কি গনির পিতামাতাও। এ অবস্থায় গনি মুলতানে নতুন বিয়ে করেও নাসিমার সঙ্গে সহজেই তার গোপন অভিসার চালাতে পারত। ধনী লোকের কুপুত্রদের এ হেন বহু কাহিনী আমাদের সকলের জানা আছে, যারা ঘরে সতী-সাধ্বী অনুগত স্ত্রী রেখেও বাইরে গোপনে অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক চালিয়ে যায়। গনিও তাই করতে পারত সহজে। তাহলে সে নাসিমাকে নিজ হাতে খুন করতে যাবে কেন ?

জজ সাহেবের মতে ৭ই ডিসেম্বর গনি নিজে এসে নাসিমাকে তার গাড়িতে নিয়ে যায়নি বা তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেনি। এ সম্বন্ধে ডাঃ মোহাম্মদ আলীর চাকরদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে

Mamun Academy

তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। নাসিমার লেখা ডায়েরী থেকে আরও জানা যায় যে নাসিমা নিজে ডাক্তারের ওপর ক্ষ্যাপা ছিল, কারণ ডাক্তার বয়স্ক ব্যক্তি হলেও তার এবং আরও কয়েকজনের লোলুপ দৃষ্টি ছিল নাসিমার রূপ-যৌবনের প্রতি। তার সংসর্গ পাওয়ার জন্যেও তারা ব্যগ্র ছিল। কিন্তু দৃঢ়চেতা নাসিমা তাদের সে সব কুপ্রস্তাবে বরাবরই বাধা দিয়ে আসছিল ঘৃনার সঙ্গে। জজ সাহেবের মতে ডাঃ মোহাম্মদ আলীরই কোন চাকর তাঁরই নির্দেশে নাসিমার খাদ্যের সঙ্গে মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করেছে। আর হয়ত বিষ প্রয়োগের ঠিক আগে বা পরে ওই ক্লিনিকেরই কেউ নাসিমার ওপরে বলাৎকার করেছে।

ডাক্তার সম্বন্ধে কড়া মন্তব্য করে জজ সাহেব বলেন :

'এই ডাক্তার একজন নিকৃষ্ট হীন-মনা লোক। তার কাজে ও কথায় কোন সঙ্গতি নেই। সত্যকে চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে বহু মিথ্যা বলেছে। সে আসামীর পর্যায়ে পড়ার উপযুক্ত। ডাক্তারের নেহাত সৌভাগ্য যে এই কেসে তাকে আজ আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হয়নি। সে বেশ চতুরতার সাথে প্রকৃত ঘটনা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়েছে ও নাসিমাকে হত্যার দায়িত্ব বেমালুম অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পেরেছে।'

আসামী আবদুল গনির মুক্তির রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা হয়। সেই আপীলের রায় প্রদান করেন তৎকালীন লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় জনাব আখলাক হোসেন।

তিনি কিন্তু সেশন জজের রায়ের মতামতের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। অবশ্য তাঁর মতেও ডাঃ মোহাম্মদ আলীর ব্যবহার,

Mamun Academy

সাক্ষ্য ও চাল-চলন মোটেই সহজ ও সন্তোষজনক ছিল না। তবে সে নিজেই নাসিমাকে খুন করেছে বা করিয়েছে, এই সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল না। বরং নাসিমা যে রকম দৃঢ়চেতা ও আত্মবিশ্বাসী মেয়ে ছিল তাতে গনির পক্ষে মুলতানে নতুন বিয়ে করার পরে নাসিমার সঙ্গে তার পূর্বের সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়াও এক্ষেত্রে সম্ভবপর ছিল না। তাই মনে হয় আসামী আবদুল গনির প্রবল ইচ্ছা ছিল যে তার বিয়ের আগেই নাসিমাকে চিরদিনের মত সরিয়ে ফেলে পথের কাঁটা পরিষ্কার করা।

ঘটনার বিবরণ থেকে মনে হয় যে ডাঃ মোহাম্মদ আলী ইচ্ছাকৃত ভাবে আসামী গনি ও তার ধনী পিতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সত্য গোপন করেছে ও তারা প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করেনি। বরং দেখা যায় যে নাসিমার সংজ্ঞাহীন দেহ তার ক্লিনিকের কক্ষে আনার পর গনি অথবা তার পিতা ওই ডাক্তারের নিকট আসে ও তাকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করে। তাই বোধহয় তাদের আহ্বানে ডাক্তার নাসিমাকে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে রেখে পাশের ঘরে গিয়ে ডাক্তার ওদেরই সঙ্গে দীর্ঘ আধঘন্টা যাবত গোপনে শলা পরামর্শ চালায়। তখনই ওরা একত্রে বসে প্রকৃত ঘটনা চাপা দেবার ফন্দি-ফিকির আঁটে। আর তার চাকরদেরও ডাক্তার সেই ভাবেই নির্দেশ দিয়ে দেয়। নাসিমার যখন জীবন নিয়ে টানাটানি চলছিল সেই সময় তাকে ওই অবস্থায় ফেলে ডাক্তারের অন্য রোগীর কলে দীর্ঘ আধঘন্টার জন্যে বাইরে যাওয়ার কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কৈফিয়ত ছিল ডাক্তারের সময় কাটাবার একটা অজুহাত মাত্র। দুঃখের বিষয় প্রকৃত ঘটনার কোন দেখা সাক্ষ্য নেই। মাননীয় বিচারপতি এই সঙ্গে পুলিশের ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত সম্বন্ধেও কড়া বিরূপ

মন্তব্য করেন। আসামী গনির মত তার পিতাও এই খুনের জন্যে দায়ী হতে পারে। কারণ প্রকৃতপক্ষে সে-ই ছিল নাসিমার সবচেয়ে বড় শত্রু। এ-ও ত হতে পারে যে গনির ধনী পিতা ডাক্তার মোহাম্মদ আলীর বাবুর্চিকে টাকা দিয়ে বাধ্য করে নাসিমার খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করিয়েছে। (ঘটনার পর ডাঃ মোহাম্মদ আলীর তৎকালীন সেই বাবুর্চি উধাও হয়ে যায় এবং বহু চেষ্টা করেও তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।)

এহেন সন্দেহের যেখানে অবকাশ থাকে, সেখানে আসামীকে সাজা দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। বৃটিশ আইনের মত ইসলামী আইনেও বলে : 'ইমামের পক্ষে যদি (বিচারে) ভুল করতেই হয়, তবে ভুল করে আসামীকে খালাশ দেয়াই ভাল, ভুল করে সাজা দেয়া উচিত নয়।' এ সম্বন্ধে হযরত আলীও বলেছেন : 'আল্লাহ সব কিছুই দেখছেন যা আমরা জানছি না বা দেখছি না। সেই সব অজ্ঞাত অপরাধের বিচার তিনিই করবেন।'

অতঃপর এই মামলায় বিচারপতি সন্দেহের অবকাশে আসামী আবদুল গনিকে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন।

স্বৈরিনী আয়েশা

আয়েশা খাতুন ছিল আয়ের উদ্দিনের স্ত্রী, বগুড়া জিলার একটি গ্রামে ছিল তাদের বাস। ঘটনার প্রায় চার বৎসর আগে ১৯৫৭ সালে তাদের বিয়ে হয়।

বিয়ের কিছুদিন পরেই আবদুল গনি নামক এক যুবকের সঙ্গে আয়ের উদ্দিনের বন্ধুত্ব হয়, গনি বন্ধুর বাড়িতে হামেশা যাতায়াত করত। সেই সূত্রে গনির স্ত্রী আয়েশার সঙ্গে গনির পরিচয়ের সুযোগ হয়, ক্রমে ক্রমে সেই পরিচয় অবৈধ প্রণয়ে পরিণত হয়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে গনি প্রায়ই আয়েশার বাড়িতে যাতায়াত করত। তারা গোপনে অবৈধ সংসর্গেও লিপ্ত হতে শুরু করল।

গ্রামবাসী ও আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের এই বাড়াবাড়িতে কানা-ঘুষা শুরু করল। কিন্তু আয়ের উদ্দিন এতে খুব বেশি কান দিল না. হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে গ্রাম থেকে আয়েশা ও গনি উভয়েই উধাও হয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাদের কোন হদিস পাওয়া গেল না। অগত্যা আয়ের উদ্দিন স্থানীয় জয়পুরহাট থানায় এই খবর দিল। সে নিজেও নানা স্থানে তার স্ত্রীর খোঁজ করতে লাগল।

অবশেষে রাজশাহী জিলার নমশহর গ্রামে গনির এক বোনের বাড়িতে উভয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। সেখানেই আয়েশা ও গনি

Mamun Academy

পালিয়ে গিয়ে একত্রে বসবাস করছিল। সেখান থেকে আবার আয়েশাকে নিয়ে এল আয়ের উদ্দিন তার নিজ বাড়িতে। এই সব কেলেঙ্কারীর পরেও পুনরায় আয়েশাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে ঘোর আপত্তি জানাল আয়ের উদ্দিনের পিতা খায়ের উদ্দিন মণ্ডল। তিনি ছেলেকে আদেশ দিলেন ওই চরিত্রহীনা স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তালাক দিতে ও অন্য মেয়েকে বিয়ে করে ঘর সংসার পাততে।

কিন্তু আয়ের উদ্দিন সত্যিই তার স্ত্রীকে ভালবাসত। তাই সে তাকে তালাক দিতে কিছুতেই রাজি হল না। আয়েশা জীবনে আর এ রকম ভুল করবে না এই আশ্বাস সে তার স্ত্রীর কাছ থেকে পেয়ে তাকে নিয়ে আবার ঘর সংসার করতে লাগল। আয়ের উদ্দিনের পিতা কিন্তু এ আচরণ সহ্য করতে পারল না। সে ভয়ানক রেগে গিয়ে পুত্রের সাথে সকল সংস্রব ত্যাগ করে তাকে নিজ সংসার থেকে তাড়িয়ে দিল। সেই থেকে আয়ের উদ্দিন অন্য বাসায় স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা ভাবে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু হতভাগ্য সে। স্ত্রী চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য সে তখনও বুঝতে পারেনি।

স্বামীর এই মহানুভবতার প্রতিদান কিন্তু আয়েশা দিতে পারেনি। বরং সে গোপনে তার পাপ কার্য চালিয়েই যেতে লাগল। কিছুদিন পরে দুষ্ট গ্রহের মত আবার সেই গনি এসে জুটল তার গোপন সঙ্গী হিসাবে। আয়ের উদ্দিনের অগোচরে আবার সে আয়েশার কাছে আনাগোনা শুরু করল। এবার কিন্তু শুধু গনিই নয় আরও দু-একজনের সংগেও আয়েশার গোপন অভিসার চলতে লাগল।

কিন্তু এ সবের প্রধান বাধা হল আয়েশার স্বামী আয়ের উদ্দিন, যে বেঁচে থাকা পর্যন্ত তারা যথেচ্ছভাবে এসব পাপকার্য চালিয়ে

Mamun Academy

যেতে পারছিল না।

মাঝে মাঝে দেখা যেত আয়েশা, গনি, খাজেমুদ্দিন এবং আরও একজন একত্রে বসে গোপনে কি যেন আলোচনায় ব্যস্ত। আয়েশাকে ফিরিয়ে আনার প্রায় এক বৎসর পরে এই পাপের পরিণতি ঘটল এক চরম দুর্ঘটনায়।

১৯৬১ সালের ৮ই এপ্রিল। সেদিন হাটের দিন। আয়ের উদ্দিন বিকালে গেল ভাটনা হাটে হাট করতে। আয়েশা একা বাড়িতে রইল। সেদিন সন্ধ্যার সংগে সংগে খাজেমুদ্দিন আয়েশার কাছে এল। তাকে দেখে আয়েশাও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। খাজেমুদ্দিন তার কাপড়ের ভেতর থেকে একটা কাগজের প্যাকেট আয়েশার হাতে গুঁজে দিয়ে তড়িৎ গতিতে সরে পড়ল।

এই ঘটনাটি দেখতে পেল কছিমুদ্দিন মণ্ডল নামক তাদের এক গ্রামবাসী। সে এসে আয়েশার কাছে জানতে চাইল যে খাজেমুদ্দিন তার কাছে এত গোপনে কি দিয়ে গেল। এই প্রশ্ন শুনে প্রথমে আয়েশা থতমত খেয়ে গেল। প্রশ্নটি সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কছিমুদ্দিনও ছাড়বার পাত্র নয়। এই রহস্য সে-ও না জেনে যাবে না। অবশেষে আয়েশা জানাল যে তার বিড়ি খাওয়ার বদ-অভ্যাস আছে, তাই সে গোপনে খাজেমুদ্দিনকে বিড়ি আনতে দিয়েছিল, ওই প্যাকেটে করে সে এইমাত্র বিড়ি দিয়ে গেল। যদিও ওই প্যাকেটটি বিড়ির প্যাকেট বলে মনে হচ্ছিল না, তবুও কছি-মুদ্দিন আর কিছু না বলে চলে গেল।

সন্ধ্যার আধঘন্টা পরে আয়ের উদ্দিন হাট থেকে ফিরে এল। তার হাতে ছিল সেরখানেক চাউল ও ছোট এক পাত্র দৈ। খুব ক্ষুধা লেগেছিল আয়ের উদ্দিনের, সে তাড়াতাড়ি হাতের জিনিস নামিয়ে

Mamun Academy

রান্না করা ডাল কত ভাল হয়েছে।' এই বলে আয়েশা নিজেই ডালের বাটিটি হাতে নিয়ে কাত করে ঢেলে দিল স্বামীর গোশত-দৈ মাখান ভাতের মধ্যে। আয়ের উদ্দিন হাত দিয়ে ঠেকাতে গিয়েও পারল না। অগত্যা সে ডাল, গোশত, ভাত, দৈ একসঙ্গে মাখিয়ে তাই খেয়ে নিল।

খেয়ে ওঠার আধঘন্টার মধ্যেই আয়ের উদ্দিনের গলায় বুকে ও পেটে অসহ্য জ্বালা শুরু হল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে চিৎকার শুরু করে দিল, আর সেই সঙ্গে শুরু হল দাস্ত ও বমি। হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে সে ছটফট্ করতে লাগল। ভয়ানক যন্ত্রণায় সে ক্রমাগত ওঠাবসা করতে লাগল।

তার চিৎকারে আশেপাশের লোক এসে জড় হল তার বাড়িতে। তার বাপও দৌড়ে এল। তারা এসে আয়ের উদ্দিনকে শুশ্রূষা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আয়ের উদ্দিন একবার গলায়, একবার বুকে আবার পেটে হাত দিয়ে চেপে ধরে বলতে লাগল, 'উঃ! জ্বলে গেল! পুড়ে গেল! আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি বোধহয় আর বাঁচব না। আয়েশা আমার পাতে ডাল ঢেলে দেয়ার পর তা খেয়েই আমার এই জ্বালা শুরু হয়েছে, যেখানে সেই ডাল পড়েছে সেখানেই আগুনের মত জ্বলে যাচ্ছে!'

লক্ষ্য করা গেল যে স্বামীর এই দুঃসময়েও আয়েশা সেখানে নেই। যখন তার ডাক পড়ল তখন সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চোরের মত ঘরের এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের বাড়ির একমাত্র দরজায় তখন অনেক লোকের ভীড়। তাই সেদিক দিয়ে সে বাইরেও যেতে পারছিল না। ক্রমেই ভীড় বেড়ে চলল, অনেকেই আয়েশার খোঁজ করল। এমন সময় আয়েশা ঘরের পেছনের জানালার কাঠের শিক

ভেঙে সেখান দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কয়েকজন লোক দেখে ফেলল তাকে। হৈ চৈ পড়ে গেল সমস্ত লোকের মধ্যে —ধরে ফেলা হল আয়েশাকে সেই অবস্থায়। ভয়ে সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। কোন কথা বলতে পারল না। তারপর তাকে তার শ্বশুর বাড়ি নিয়ে আটকে রাখা হল।

লোকের প্রশ্নের উত্তরে অস্থির আয়ের উদ্দিন অতি কষ্টে জানাল যে আয়েশা তাকে যে ডাল খাইয়েছে নিশ্চয়ই তার মধ্যে বিষ মিশানো ছিল। সেই ডাল খাবার পর থেকেই সে অস্থিরতা বোধ করছিল, তার সমস্ত কণ্ঠনালী ও পেট জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল।

ডাক্তার ডাকা হল, কিন্তু কোন সুচিকিৎসা করার পূর্বেই আধ-ঘন্টার মধ্যে আয়ের উদ্দিন এই মরণ যন্ত্রণা থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি পেল।

গ্রাম জুড়ে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। দেখতে দেখতে সমস্ত গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল আয়ের উদ্দিনের বাড়িতে। অধিকাংশ লোকই তাকে পেল মৃত অবস্থায়। একটা অসহ্য ব্যথার ভাব আয়ের উদ্দিনের চোখে মুখে তখনও পরিস্ফুট।

পরদিন সকালে গ্রামের প্রধানরা এসে মিলিত হল সেই বাড়িতে। তাদের মধ্যে ছিল মনীরুদ্দিন মণ্ডল, তাহেরুদ্দিন মণ্ডল, আফাজুদ্দিন মণ্ডল ও অন্যান্যগণ। এদের সকলের সামনে আয়েশা দোষ স্বীকার করে জানাল যে সে-ই বিষ প্রয়োগে তার স্বামীকে হত্যা করেছে। মাতব্বরদের প্রশ্নের উত্তরে আয়েশা আরও জানাল যে আগের দিন বিকালে খাজেমুদ্দিন তাকে কাগজের প্যাকেটে করে বিষ এনে দিয়েছিল, সেই বিষ সে আলেফার বাড়ি থেকে আনা ডালের সঙ্গে মিশিয়ে তা স্বামীর ভাতের থালায় ঢেলে দিয়েছিল।

Mamun Academy

আয়েশা আরও জানাল যে তাদের চৌকির নিচে রাখা একটা কাঁসার বাটিতে তখনও ওই বিষ মিশানো কিছু ডাল অবশিষ্ট রয়েছে।

সেই ডাল মাতব্বরদের সামনে আনা হল। তা সত্যিই বিষাক্ত কিনা সেটা পরখ করে দেখার জন্যে একটা মুরগীকে কিছুটা ডাল খাওয়ানো হল, দেখা গেল যে সেই ডাল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুরগীটি ছট্‌ফট্‌ করে মারা গেল।

তারপর মাতব্বরেরা আলেফার বাড়িতে গিয়ে সেখানেও একটি পাত্রে কিছু ডাল পেল। আর একটি মুরগীকে তারা সেই ডাল খাওয়াল। এই মুরগীটি কিন্তু ডাল খেয়েও দিব্যি ঘুরে বেড়াতে লাগল। সবাই এখন স্পষ্ট বুঝতে পারল যে ওই ডাল প্রথমে ভালই ছিল, পরে আয়েশাই ওতে বিষ মিশিয়ে তা খাইয়ে নিজ স্বামীকে হত্যা করেছে। থানায় এজাহার দেয়া হল, পুলিশ এসে আয়েশা, খাজিমুদ্দিন ও গনি এদের তিনজনকেই গ্রেপ্তার করল। পুলিশ কাঁসার বাটির ডাল, দই এবং আলেফার বাড়ির ডাল নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিল। আয়েন উদ্দিনের মৃতদেহ পরীক্ষার পর দেখা গেল যে করবী গাছের বিষ খাইয়েই তার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে, তার চৌকির নিচ থেকে পাওয়া কাঁসার বাটির ডালেও রাসায়নিক পরীক্ষার পর দেখা গেল যে তাতেও ওই একই বিষ মিশানো আছে। পরীক্ষায় আলেফার বাড়ির ডালে বা দই-এ কোন বিষ পাওয়া গেল না।

পুলিশ আয়েশা খাতুন, খাজেমুদ্দিন ও আবদুল গনির বিরুদ্ধে হত্যা ও হত্যায় সহযোগিতা করার অপরাধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৩০২/১০৯ ধারামতে এই মামলায় চার্জশীট দাখিল করল।

বগুড়ার তৎকালীন জিলা ও সেশন জজ (পরবর্তী কালে হাইকোর্টের বিচারপতি) মিঃ আব্দুস সোবহান চৌধুরী (মরহুম) চারজন এসে-

Mamun Academy

সরের সাহায্যে এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার করেন।

সাক্ষ্য প্রমাণের পর চারজন এসেসরই একমত হয়ে দু'জন আসামী আয়েশা খাতুন ও খাজেমুদ্দিনকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন। এসেসরদের সঙ্গে একমত হয়ে সেশন জজ বাহাদুর উভয় আসামীকে ইচ্ছাকৃতভাবে আয়ের উদ্দিনকে হত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন কারা-দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীরা ঢাকা হাইকোর্টে আপীল করে। মাননীয় বিচারপতি জনাব বাকের ও বিচারপতি জনাব আব্দুল হাকিমের এজলাসে সেই আপীলের শুনানী হয়। বিচারপতি হাকিম তাঁর বিজ্ঞ রায়ে সমস্ত ঘটনা বিচার বিশ্লেষণ করে উপরোক্ত দু'জন আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাদের দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

Mamun Academy

ট্রাঙ্ক রোডে খুন

ধর্মভীরু আবদুল কাদের তার ভাগিনেয় আবদুল রহমানের সঙ্গে একত্রে চাউলের ব্যবসা করত। আবদুল কাদের আবার তবলীগের কাজেই ব্যস্ত থাকত সারাক্ষণ, আর তার ভাগিনেয় আবদুর রহমান মামার কাছ থেকে পুঁজির টাকা নিয়ে দাউদকান্দির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে চাউল কিনে এনে দাউদকান্দি বাজারে বিক্রি করে ব্যবসা চালাত। লাভু মিয়া নামক আর এক ব্যক্তিও আবদুর রহমানকে তার চাউলের ব্যবসায়ে সাহায্য করত। তবে ব্যবসায়ের সমস্ত মূলধন আবদুল কাদেরই যোগাত।

দাউদকান্দি বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী খোরশেদ, মঞ্জু, আবদুর রশিদ প্রমুখ চাউলের ব্যাপারীরা আবদুল কাদেরের চাউল বাজারে খুচরা বিক্রি করত। একবার খোরশেদের নিকট আবদুল কাদেরের চাউলের বাবদ ৬০০ টাকা পাওনা হয়। বারংবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও উক্ত টাকা দিতে বিলম্ব হওয়ায় উভয়ের মধ্যে একদিন খুব বচসাও হয়। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বাজার কমিটির কাছে পৌঁছে। বাজার কমিটির চাপে খোরশেদ কাদেরকে তখনই ৩০০ টাকা দিতে বাধ্য হয়। বাকী টাকাও কিছুদিনের মধ্যে পরিশোধ করতে সে অঙ্গীকার করে। খোরশেদ এ নিয়ে খুব খাপ্পা হয়ে রইল আবদুল কাদের ও তার ভাগিনেয়র উপর।

এর পর একদিন ঠিক হল চাউল কেনার উদ্দেশ্যে আবছর রহমান ২২শে অক্টোবর (১৯৬৭ সাল) পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বাজারে যাবে। সেই উদ্দেশ্যে সেদিন সন্ধ্যায় আবছুল কাদের তার ভাগিনেয়কে নগদ ১৩৭৩ টাকা দিল। ঠিক হল যে আবছর রহমান টাকা নিয়ে গৌরীপুর হয়ে পেন্নাই ঘাটে পৌছলে সেখানে লাল মিয়া এসে তাদের সংগে যোগ দিবে। তারপর দুজনে চাউল কিনতে নৌকায় 'বায়েক বাজারে' যাবে। দাউদকান্দি থেকে পেন্নাই ঘাটে যেতে হলে 'ঢাকা-কুমিল্লা' ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়েই যেতে হয়।

পূর্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী লাল মিয়া যথাসময়ে নৌকার মাঝি আনোয়ারকে সংগে নিয়ে পেন্নাই ঘাটে এসে বসে রইল আবছর রহমানের আশায়। কিন্তু আবছর রহমানের আর দেখা নেই।

ক্রমে ক্রমে এশার নামাজের ওয়াক্ত হয়ে এল তবুও আবছর রহমান এসে পৌছল না। অগত্যা অনেক রাত্রে লাল মিয়া ফিরে এসে আবছুল কাদেরকে জানাল যে অনেক রাত্র পর্যন্ত অপেক্ষা করেও রহমানের দেখা না পাওয়ায় সে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

একথা শুনে কাদের শঙ্কিত হয়ে উঠল। আবছর রহমানের কাছে অনেক টাকা, আর তা ছাড়া খোরশেদ একবার তাদের শাসিয়েছিল যে সে দেখে নেবে এরা কেমন করে চাউলের ব্যবসা চালায়। এসব চিন্তা এসে ভিড় করল কাদেরের মনে।

অস্থির হয়ে কাদের তখনই লাল মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পেন্নাই ঘাটের দিকে রওনা হল একটি রিক্সা করে। কিন্তু সেখানে বহু চেষ্টা করেও আবছর রহমানের কোন খোঁজই পেল না। অতঃপর পেন্নাই থেকে মাইল খানেক দূরে গৌরীপুরে গেল তারা, কিন্তু সেখানেও রহমানের কোন সন্ধান পেল না।

ফেরার শেষ বাস রাত্র সাড়ে দশটায়, তার পরে আর আসা মুস্কিল হবে, তাই শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে শেষ বাসে কাদের একাকী বহুরাতে দাউদকান্দি ফিরে এল। তবে লাল মিয়াকে সে সেখানে রেখে এল এই বলে যে সে যেন আবদুর রহমানকে তার বাড়ি দাউদকান্দিতে গিয়ে খোঁজ করে।

শেষ রাতের দিকে লাল মিয়া ও আনোয়ার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে এসে কাদেরের ঘুম ভাঙাল। তাদের হাতে একটি গামছা। সেটা দেখেই কাদের চিনতে পারল যে ওটা আবদুর রহমানের গামছা। উৎকণ্ঠিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেলে তোমরা রহমানের এই গামছা? আর রহমানই বা কোথায় আছে শিগগির বল।'

উত্তরে লাল মিয়া জানাল যে বড় রাস্তার (ট্রাঙ্ক রোড) পাশে তারা ওই গামছা কুড়িয়ে পেয়েছে, কিন্তু রহমানের কোন সন্ধানই করতে পারেনি।

এর পরই ফজরের নামাজের সময় কাদেরের কাছে খবর এল যে ট্রাঙ্ক রোডের পার্শে কিছু কাপড় চোপড়, একটি কাঁথা ও আবদুর রহমানের আরও কিছু জিনিস-পত্র ফুটপাথের উপর পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

এই দুঃসংবাদ শোনার পরই কাদের তার ভাগিনেয় জীবিত আছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠল। বিশেষ করে তার কাছে যখন অনেক টাকা ছিল। দেরি না করে কাদের তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল দাউদ-কান্দি থানায়। সেখানে ২৩/১০/৬১ তারিখ সকাল ৯-৩০ মিনিটে সব ঘটনা জানিয়ে সে এক এজাহার দিল।

থানার দারোগা তখনই কাদেরকে নিয়ে রওনা হল ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে।

বরইকারী গ্রামের নিকটে ঢাকা-কুমিল্লা ট্রাঙ্ক রোডের ফুটপাথের উপর তারা পেল আবদুর রহমানের দুইটি লুঙ্গি, একটি কাঁথা, একটি হিসাব বই, তার গেঞ্জি ও পাঞ্জাবী। কিন্তু আশেপাশে খোঁজ করেও জীবিত বা মৃত আবদুর রহমানের কোন সন্ধানই করতে পারলনা।

এবার পুলিশ বুঝতে পারল যে খুব সম্ভবত আবদুর রহমানকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই তার লাশের সন্ধান করতে পারল না। সেদিনের মত তারা ফিরে এল থানায়।

সেই দিনই বিকালে পুলিশের নিকট গোপন সূত্রে খবর এল যে জংলিয়া নিবাসী হযরত আলী এই খুন সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হযরত আলীর সন্ধান করে তাকে পাকড়াও করল। সে পুলিশের কাছে একটি বিবৃতি দিল। তার বিবরণ এবং এ সম্বন্ধে পুলিশ আরও তদন্ত করে যা জানতে পারল তা হল এই :

হযরত আলী একজন রিক্সা চালক। সে প্রধানতঃ ওই ট্রাঙ্ক রোডেই রিক্সা চালিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করে। ২২/১০/৬৭ তারিখে মাগরেবের নামাজের সময় হাবিবুল্লাহ নামক একজন লোক (আসামী) হযরত আলীর রিক্সা ভাড়া করতে চায় ও বলে যে সে শহীদ নগর যাবে ও রাত্রে সেখানে নতুন আমদানী করা টেলিভিশনে ছবি দেখবে। সেখানে বসে নাকি ঢাকার ছবি দেখা যাবে।

শহীদ নগর দাউদকান্দি থেকে তিন মাইল দূরে। ওকে উঠিয়ে নিয়ে আরও একজন প্যাসেঞ্জারের আশায় রিক্সাওয়ালা হযরত আলী সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। এমন সময় আবদুর রহমানও সেখানে এল। সে-ও যাবে গৌরীপুরের দিকেই। তাই সে ওই একই রিক্সায় উঠে বসল। রিক্সা বরাইকারীর ঈদগার কাছে যখন পৌঁছাল তখন দেখা গেল নায়েব আলী নামক এক ব্যক্তি রাস্তার এক পাশ

ধরে হেঁটে ওই একই দিকে এগুচ্ছে।

নায়েব আলীকে দেখে হাবিবুল্লাহ রিক্সা থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'ও মামু, কোথায় যাচ্ছ? চল না আজব চিজ টেলিভিশন দেখে আসি। ঢাকার সিনেমা এখানে বসেই নাকি দেখতে পাব।'

উত্তরে নায়েব আলী বলল, 'ঠিক আছে, চল যাই। টেলিভিশনের কথা আমিও শুনেছি।'

রিক্সা ওকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে চলছিল। হাবিবুল্লাহ রিক্সা-ওয়ালাকে একটু থামতে বলল।

রিক্সা থামতেই নায়েব আলী রিক্সার দিকে দৌড়ে এল। কাছা-কাছি এসে সে বলল, 'হাবিবুল্লাহ, আমার হাঁটতে বড় কষ্ট হচ্ছে, এই দেখ হোঁচট খেয়ে আমার পায়ের আঙ্গুল থেঁতলে গেছে।'

এ কথা শুনে সহানুভূতি দেখিয়ে হাবিবুল্লাহ রিক্সা থেকে নেমে এল। নিচু হয়ে সে নায়েব আলীর পা পরীক্ষা করে সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, 'সত্যিই ত অনেকখানি কেটে গেছে তোমার পা! আহা কি ভাবে ঘটল এই দুর্ঘটনা?'

নায়েব আলী তখন রিক্সাওয়ালার কাছে একটু কাপড় চাইল তার পায়ের ক্ষত বাঁধবার জন্যে। উত্তরে হযরত আলী জানাল যে তার কাছে কোন বাড়তি কাপড় নেই।

সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে আবদুর রহমান অধীর হয়ে উঠল। সে নায়েব আলীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'যদি তুমি যেতে চাও তবে শিগগির এসো। আমার জরুরী কাজ আছে— দেরি করার উপায় নেই। না হয়ত আমি চলি।'

ততক্ষণে নায়েব আলী দৌড়ে রিক্সার ডানদিকে এসে আব-দুর রহমানের পাশে দাঁড়াল। তার পরেই সে হঠাৎ ভোল বদলে

সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি ধারণ করল। কর্কশ স্বরে এবার সে আবদুর রহমানকে তার টাকা পয়সা যা আছে সব তখনই দিয়ে দিতে আদেশ করল।

আকস্মাৎ নায়েব আলীর অনুরূপ ব্যবহারে আবদুর রহমান আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রথমে সে ভাবল নায়েব আলী বোধহয় তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। সে বলল, 'হেঁয়ালী রাখ, এখন আর আমার দেরি করার মোটেই সময় নেই।' তারপরই সে রিক্সাওয়ালাকে আদেশ দিল, 'রিক্সা চালাও, আর দেরি করো না। আমাকে এখনই যেতে হবে।'

হযরত আলীও যেন একটু ঘাবড়ে গেল। সে যেই না রিক্সা জোরে চালাতে চেষ্টা করল, অমনি নায়েব আলী খপ্ করে তড়িৎ গতিতে আবদুর রহমানের গলা চেপে ধরল ও একঝটকায় তাকে রিক্সা থেকে নিচে নামিয়ে ফেলল। হাবিবুল্লাহও এবার দৌড়ে এসে নায়েব আলীর সঙ্গে যোগ দিল এবং দুজনে মিলে আবদুর রহমানকে মাটিতে চেপে ধরল। রহমান নিচে পড়ে তাদের চাপে গোঁ গোঁ করে গোঙাতে শুরু করল। চিৎকার করার শক্তি তখন তার ছিল না।

হঠাৎ এই কাণ্ড দেখে রিক্সাচালক হযরত আলী সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেল। সে সেখানে আর একটুও দেরি না করে তার খালি রিক্সা নিয়েই পাকা রাস্তা ধরে দিল লম্বা ছুট। এত জোরে সম্ভবতঃ সে জীবনে আর কোনদিন রিক্সা ছুটায়নি। ওরা যেন দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলতে না পারে, সেটাই তখন তার একমাত্র চিন্তা।

হযরত আলী রিক্সা নিয়ে সোজা হুগুলিয়ায় তার বাড়িতে এসে থামল। বাড়িতে পৌঁছে রিক্সা রেখে যখন সে ঘরে ঢুকল তখন ভাল করে তার জ্ঞানও ছিল না। সর্বাঙ্গ দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছিল। তার অস্থিরতা ও বিকল মানসিক অবস্থা দেখে তার স্ত্রী তাকে তৎ-

ক্ষনাৎ বিছানায় শুইয়ে দিল। তাকে বাতাস করতে লাগল, মাথায় পানিও দিল। খবর পেয়ে হযরত আলীর মামা আইয়ুব আলীও দৌড়ে এল সেখানে।

কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পরে হযরত আলী একটু সুস্থ হল। আস্তে আস্তে সে উঠে বসল। তারপর সে তার মামা ও স্ত্রীকে সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

পুলিশ হযরত আলীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে অবিলম্বে আসামী হাবিবুল্লাহ ও নায়েব আলীকে গ্রেফতার করল ২৩শে অক্টোবর বিকালে।

পুলিশের নিকট আসামী নায়েব আলী এক স্বীকারোক্তি করল। তাতে সে পুলিশ ও সাক্ষীদের ঘটনার কথা বিস্তারিতভাবে বলল।

তার কথামত পুলিশ তাকে নিয়ে ঘটনাস্থল বরইকান্দীতে এল। এখানেই রাস্তার ফুটপাথের উপরে আবদুর রহমানের জামা-কাপড় ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল। এখানে রাস্তার পাশে ছিল একটি পানি ভর্তি ডোবা। নায়েব আলী জানাল যে সেই ডোবার মধ্যেই তারা মৃত আবদুর রহমানের লাশ লুকিয়ে রেখেছে। অতঃপর পুলিশ ও সাক্ষীদের সামনে নায়েব আলী সেই ডোবার মধ্যে নামল। বুক পানিতে নেমে এক জায়গার পানির নিচ থেকে টেনে তুলল আবদুর রহমানের মৃতদেহ। সেই ডোবার মধ্যে ঘন শেওলার নিচে তারা মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছিল বলে জানাল।

পুলিশ লাশ ময়না তদন্তের জন্যে পাঠাল। ডাক্তারী পরীক্ষায় মৃতদেহের গলায় ও পেটে গভীর ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেল। সেই ক্ষতের কারণেই আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়েছে বলে ডাক্তার মত প্রকাশ করলেন।

ইতিপূর্বে আসামী হাবিবুল্লাহও একটি স্বীকারোক্তি করে পুলি-

Mamun Academy

শের কাছে। সেই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ হাবিবুল্লাহর বাড়ি তল্লাসী করে তার ঘরের এক স্টীলের ট্রাঙ্কের ভেতরে রাখা একটি বই-এর পৃষ্ঠার ভেতর থেকে ২টি ৫০টাকার নোট খুঁজে পেল। পুলিশ নোট দুটি সাক্ষীদের সামনে সীজ (Seize) করে নিল। আবদুল কাদের ওই নোট দুটি তারই বলে সনাক্ত করে জানায় যে নোট দুটি সে দিয়েছিল আবদুর রহমানকে চাউল কেনার উদ্দেশ্যে।

তারপর পুলিশ অন্য আসামী খোরশেদের বাড়িও তল্লাশী করে। সেখান থেকে ১০৮ টাকা ৬৪ পয়সা উদ্ধার করে। অতঃপর পুলিশ উপরোক্ত আসামীদের ও বরকত আলীকে কুমিল্লা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করে।

ম্যাজিস্ট্রেট যথারীতি সকলের বিবৃতি রেকর্ড করে নেন। তদন্তের পর পুলিশ শেষপর্যন্ত হাবিবুল্লাহ, নায়েব আলী ও খোরশেদ সহ মোট ৭ জন আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে।

কিন্তু কোর্টে প্রাথমিক তদন্তের পর মাত্র দুজন আসামী অর্থাৎ হাবিবুল্লাহ ও নায়েব আলীকে দায়রায় সোপর্দ করে। খোরশেদ সহ অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষী প্রমাণ না থাকাতে নিম্ন কোর্ট থেকেই তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

দায়রা বিচারের পর মাননীয় সেশন জজ জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে উভয় আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করেন ও পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারা মতে আবদুর রহমানকে খুনের অপরাধে উভয়কেই চরম দণ্ড অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীদ্বয় মহামান্য ঢাকা হাইকোর্টে আপীল করে। মাননীয় বিচারপতি সালাহ্‌উদ্দিন আহম্মদ ও বিচার-

Mamun Academy

পতি আবদুল হাই চৌধুরী সমস্ত ঘটনা ও সাক্ষ্য প্রমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে উভয় আসামীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ হ্রাস করে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

Mamun Academy

রেল লাইনের হত্যাকাণ্ড

Mamun Academy

পশ্চিম পাকিস্তানের লারকানা ও শুক্কুরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে দেশের এক প্রধান রেল পথ।

১৯৬০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর রাত্রে সেই পথে চলছিল কোয়েটা মেল ট্রেন লারকানা থেকে শুক্কুরের দিকে প্রচণ্ড বেগে। সেই লাইনের ১৭৭ নম্বর মাইল পোস্টের কাছাকাছি স্থানটি ছিল নির্জন ও জঙ্গলাকীর্ণ। সেখানে ট্রেনের ড্রাইভার একটি মোড় ঘোরার পর সামনে লাইনের দিকে তাকিয়ে আতকে উঠল সে। দেখল একেবারে কাছে লাইনের ওপর শুয়ে আছে একজন মানুষ।

বারবার হুইসেল দেয়া সত্ত্বেও একটু নড়ল না লোকটি। ব্যাপার কি? আত্মহত্যার উদ্দেশ্যেই কি লোকটি ওখানে শুয়ে আছে? মহা ফাঁপরে পড়ল ট্রেনের ড্রাইভার। ওই অবস্থায় হঠাৎ ব্রেক কষে তক্ষুণি গাড়ি থামানোও সম্ভব নয়, তাহলে ট্রেনের মারাত্মক দুর্ঘটনার ঘটতে পারে। একটি জীবন বাঁচাতে গিয়ে ট্রেনের শত শত যাত্রীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই ড্রাইভার ট্রেনের গতি যথা সম্ভব থামাতে থামাতেও কঠিন লৌহ চাকার তলে পড়ে গেল লোকটি। আরও কিছুদূর এগিয়ে ট্রেনটি শেষ পর্যন্ত থেমে পড়ল।

অন্ধকারে হারিকেন নিয়ে দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেল। ট্রেনের লোকজনের সচকিত, যাত্রীরা অনেকেই নেমে এল। দেখা গেল

একটি সদ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত মানুষের দেহ ছড়িয়ে আছে রেল লাইনের পাশে। সবার মুখে একটা চাপা হা-হুতাশ শোনা গেল। কেউ বলল আত্মহত্যা করেছে লোকটা। আবার কেউ বলল, লোকটা মাতাল, তাই অ্যাকসিডেণ্ট করেছে। কিছুক্ষণ পর ট্রেনটি আবার হুইসেল দিয়ে এগিয়ে গেল গন্তব্য স্থানে।

পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর সকাল সাতটার সময় রেলওয়ের কি ম্যান খামিসো লাইনের ওপর ওই স্থানে দেখতে পেল একটি রক্তাক্ত উলঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনা-স্থলে এসে দেখল যে একটি অজ্ঞাত মানুষের মৃতদেহ খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থায় রেল লাইনের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। আর মৃতদেহের কিছু অংশ একখণ্ড কাপড় দ্বারা শক্তভাবে রেল লাইনের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। মৃতদেহ থেকে প্রায় ৩০ কদম দূরে একজোড়া জুতাও পাওয়া গেল। মৃত লোকটির পায়ের জুতা ছিল সে দুটি। পুলিশ তদন্তের সময়ে আরও দূরে মাঠের মধ্যে পেল একটি বন্দুকের লাই-সেন্স, লাইসেন্সধারীর নাম আবুবকর চান্দিও।

পুলিশ এই ঘটনাকে একটি হত্যাকাণ্ড মনে করে একটি কেস নিয়ে তদন্ত শুরু করল। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্যে লারকানা সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হল। লাশের ফটোগ্রাফও নেয়া হল। পরে ওই ফটোগ্রাফ থেকে জানা যায় যে মৃত লোকটির নাম ছিল আবু-বকর চান্দিও। বাড়ি তালুকা কাম্বার। কি জন্যে সে রেল লাইনের নিচে পড়ে মারা গেল তা কিন্তু তখনকার মত রহস্যাবৃতই রয়ে গেল।

আরও কয়েক মাস পরে ১৯৬১ সালের ১০ই মার্চ তারিখে ঠিক সেই একই স্থানে অর্থাৎ রেল লাইনের ১৭৭/২০ নম্বর মাইল পোস্টের কাছে আবার পাওয়া গেল আরও একটি রহস্যময় মৃতদেহ। লারকানা

রেল স্টেশনের গেট কিপার গোলাব সেদিন সকালে লাইনে প্যাট্রোল ডিউটি দেয়ার সময় হঠাৎ আঁতকে উঠল সামনে লাইনের উপর একটি মৃতদেহ দেখে। আরও কাছে গিয়ে সে দেখতে পেল একটি রক্তাক্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ পড়ে আছে সেখানে। এবারও দেখা গেল যে মৃতদেহের কিছু অংশ একটি পাগড়ী দিয়ে শক্তভাবে বাঁধা হয়েছে রেল লাইনের সঙ্গে আর শরীরের অন্যান্য অংশ ছড়িয়ে আছে রেল লাইনের আশেপাশে।

এটাকেও একটি হত্যাকাণ্ড মনে করে পুলিশ আরও একটি কেস রেকর্ড করল। তদন্তের সময়ে পুলিশ নিকটবর্তী এক গম ক্ষেতের ভেতর থেকে কয়েক টুকরো ছিন্ন কাপড় ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পেলনা। মৃতদেহের ফটো নেয়া হল। সেই ফটো লায়লপুরের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পাকিস্তানে' প্রকাশিত হল। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে কেউ এগিয়ে এল না।

এই ঘটনার মাত্র দুই দিন পরে অর্থাৎ ১২ই মার্চ ৬. তারিখ সকালে ওই রেল লাইনেরই পাশে পাওয়া গেল ওয়াহেদ বখশ নামে আর এক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায়। পূর্বের দুটি মৃতদেহ রেল-লাইনের ঠিক যে স্থানে পাওয়া গিয়েছিল তারই কাছাকাছি রেল লাইনের পাশ থেকে ওয়াহেদ বখশের চেতনাহীন দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হল। দেখা গেল অল্পের জন্যে তার দেহ চলন্ত গাড়ির নিচে পড়েনি।

হাসপাতালে ওয়াহেদ বখশের জ্ঞান ফিরে এল। সেখানে সে পুলিশের নিকট যে জবানবন্দী দিল তা থেকে জানা গেল ঐ ঘটনার আগের দিন বিকালে ওয়াহেদ 'জিন্নাহ বাগে' আরও কয়েকজন লোকের সঙ্গে বসে তাস খেলছিল। খেলার মধ্যে একজন অপরিচিত লোক

এসে তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দেয়। সন্ধ্যার আগেই খেলা শেষ হলে সবাই যে যার কাজে চলে গেল। কেবলমাত্র ওই অপরিচিত লোকটিই সেখানে বসে রইল।

ওয়াহেদ তখন শহরের দিকে পা বাড়াল। আর সেই অপরিচিত লোকটিও (নাম মিনহুর) তার পিছু পিছু আসতে লাগল। এক সময় লোকটি তার খুব কাছে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'শোন, এই কাছেই দুটি হিন্দু মেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তুমি যদি আমার সঙ্গে আসো তবে একজন আজ রাতের জন্যে তোমার হতে পারে। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

ওয়াহেদ এই প্রস্তাবে রাজি হল না। বলল, 'দেখ, এটা পবিত্র রমজান মাস, আর আমি রোজাদার তোমার এই জঘন্য প্রস্তাবে আমি রাজি নই।' এই বলে ওয়াহেদ নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী এক মসজিদের দিকে রওয়ানা হল।

তখন মিনহুর ওয়াহেদকে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। তুমি নামাজ পড়তে থাক আর আমি বাজার থেকে কিছু খাবার কিনে আনি। দু'জনে খাব।' এই বলে মিনহুর দ্রুত বাজারের দিকে চলে গেল।

নামাজ পড়ে ওয়াহেদ মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখতে পেল মিনহুর ঠিক দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার রুটি ও পাক করা কলজে।

মিনহুর ওয়াহেদকে নিয়ে প্রায় ৪০০ কদম দূরে গিয়ে এক নির্জন গম ক্ষেতের মধ্যে বসল। সে বলল, 'চল, এখানে বসেই খাবার খেয়ে নিই।' সেখানে বসেই দুজনে কলজে ও রুটি খেয়ে নিল পেট ভরে।

কিন্তু খাবারপরই ওয়াহেদ বখশের মাথা ঘুরতে লাগল। সে আর বসে থাকতে না পেরে ওখানেই শুয়ে পড়ল। সমস্ত পৃথিবী যেন ঘুরতে

লাগল তার চোখের সামনে। তারপর আর কিছুই মনে নেই তার।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে হাসপাতালে। জ্ঞান ফিরতেই সে চমকে উঠে দেখতে পেল যে দশ টাকার নোটটি ও তার কানের সোনার রিংটি উধাও হয়েছে। কিভাবে তাকে রেল লাইনের কাছে আনা হল সে সব সে কিছুই বলতে পারল না। আসামী মিনহুরের নামও সে বলতে পারল না। তবে সে জানাল যে তাকে দেখলে সে অবশ্যই চিনতে পারবে।

হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল। পরে পরীক্ষায় দেখা গেল যে ধুতুরার বিষ মেশানো পাক করা কলজে খেয়েই সে জ্ঞান হারিয়েছিল।

এরপর দুই মাস চুপচাপ। পুলিশ ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল আসামীর সন্ধানে।

এমনি সময় ১৯শে মে তারিখে কাম্বারের জমিদার ওডেরা বকশাল খান তাঁর বৈঠকখানায় বসে বন্ধু মোহাম্মদ হোসেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। হঠাৎ সে সময় ভীত সন্ত্রস্ত একজন লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল সেই ঘরে। সে ঘরের মধ্যে কোথাও পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আগন্তুকের এহেন হাবভাবে জমিদার ও তাঁর বন্ধু বিস্মিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে তোমার? ওরকম ছটফট করছ কেন তুমি?' এই বলে তিনি তাকে ধরে ফেললেন। উত্তরে আগন্তুক জমিদারের পা জড়িয়ে ধরে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করল। সে ভীত কণ্ঠে জানাল যে লারকানার পুলিশ তাকে তাড়া করেছে, তাই সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশের হাতে পড়লে তার আর রক্ষা নেই।

লোকটির নাম মিনহুর।

Mamun Academy

জমিদার জিজ্ঞেস করলেন, 'পুলিশ কেন তোমাকে তাড়া করেছে? সব খুলে বল, দেখি আমরা তোমার জন্যে কি করতে পারি।'

জমিদারের সহানুভূতি পেয়ে সে এক গেলাস পানি চাইল। পানি খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে মিনহুর বলল :

'জনাব আমি মহাপাপী। আমি পাক করা কলজের সাথে ধুতুরার বিষ মিশিয়ে তা খাইয়ে দুইজন লোককে অজ্ঞান করে তাদের নিকটবর্তী রেল লাইনে টেনে নিয়ে যাই। তারপর সেই অজ্ঞান দেহ সেই লাইনের সঙ্গে বেঁধে রেখে তাদের গাড়ির তলায় পিষে হত্যা করি। কিন্তু আমার তৃতীয় শিকার কোনক্রমে রেল লাইন থেকে নিচে পড়ে যায়। ফলে সে কাটা না পড়ে বেঁচে যায়। সেই ব্যক্তিই পুলিশকে সব বলে দিয়েছে। এখন পুলিশ আমাকে গ্রেফতারের জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

কিভাবে সে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলো করেছিল তা সবই খুলে বলল জমিদারকে। জমিদার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটক করে ফেললেন। অতঃপর খবর পেয়ে লারকানার পুলিশ সেই দিনই মিনহুরকে গ্রেফতার করল। পুলিশের নিকটও আসামী অপরাধ স্বীকার করল।

পরদিন পুলিশ তাকে কাম্বারের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আলী রেজার নিকট হাজির করল। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট মিনহুরের যে স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেন তা যেমন অদ্ভুত তেমনি নৃশংস, স্বীকারোক্তির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেয়া গেল :

'প্রায় ছয়মাস আগে আমি লারকানায় আসি। একদিন দুপুরে আমি 'তাজার বাগে' যাই। সেখানে দেখি বহু লোক তাস খেলছে। আমিও তাদের সঙ্গে তাস খেলায় যোগ দিই। বিকালের দিকে ওই সব অপরিচিত লোকেরা চলে যায়। কেবল আমি ও আর একজন

Mamun Academy

খেলার সাথী রইলাম সেখানে।

এবার আমাদের পরিচয় হল, জানলাম তার নাম বক্কর চান্দিও। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম যে সে কেন এখানে এসেছে। উত্তরে সে জানাল যে সে তার বন্দুকের লাইসেন্স রিনিউ করতে এসেছে। আমি তাকে বল্লাম যে আমারও একটা জরুরী কাজ আছে। যদি এ কাজে বক্কর আমাকে সাহায্য করে তবে খুব ভাল হয়। বক্কর জানাল যে এক মুন্সির কাছে তার কাজ আছে। মুন্সির সঙ্গে প্রথমে সে দেখা করে তারপরে আমাকে সাহায্য করতে পারে।

তারপর সে জানতে চাইল, আমার কি কাজ। আমি তখন তাকে বললাম যে কাছেই দুজন হিন্দু তরুণী আমার অপেক্ষায় আছে। তাদের আমি ঘর থেকে বের করে এনেছি। যদি সে আমার সঙ্গে আসতে রাজি হয় তবে আমরা উভয়ে এক একজন করে তরুণী ও তাদের সম্পত্তি ভোগ করতে পারি।'

বক্কর এই প্রস্তাবে রাজি হল। তবে সে প্রথমে মুন্সির কাছে গিয়ে তার কাজ সেরে তারপরে আমার সঙ্গে যাবে বলে কথা দিল। অতঃপর আমরা উভয়ে মুন্সির বাড়ি গেলাম। আমি বাইরে অপেক্ষা করতে থাকলাম। বক্কর ভেতরে গিয়ে মুন্সির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে এল। সে ফিরে এসে আমাকে জানাল যে এখানকার কাজ শেষ করতে তার আরও দুই-তিন দিন লাগবে। এখন সে আমার সঙ্গে যেতে রাজি আছে।

আমি তখন খাবার জন্যে রুটি ও পাক করা কলজের গোশত কিনে নিয়ে রেল লাইন ধরে এগুতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই রেল লাইনের নিকটস্থ একটি গম ক্ষেতের মধ্যে এসে পড়লাম।

এখানে এসে বকর বলল যে সে খুব ক্ষুধার্ত, কারণ সে দুপুরের খানা খায়নি।

তখন আমরা ঐ গম ক্ষেতের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গায় বসে রুটি ও কলজে বের করে খাবার আয়োজন করলাম। আগেই আমি নিজ গ্রাম থেকে কিছু গুঁড়া ধুতুরার বিষ সঙ্গে করে এনেছিলাম বকরের অজ্ঞাতে আমি তার অংশের কলজের গোশতের সঙ্গে সেই ধুতুরার বিষ মিশিয়ে দিলাম। তারপর আমরা খেতে শুরু করলাম

বকর গোগ্রাসে সেই রুটি ও কলজে খেতে লাগল। আমি আস্তে আস্তে আমার অংশ খেয়ে চললাম। খাবার পরে আমরা ধুমপান করলাম। এবার বকর অস্থিরতা প্রকাশ করল ও একটু পরে মাতলামি শুরু করল। বুঝলাম, বিষের কাজ শুরু হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে সে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ল। আমি তখন তার পকেট হাতড়ে ২৫০ টাকা বের করে নিলাম। তারপর অন্ধকার হয়ে গেলে আমি তার অজ্ঞান দেহটা টেনে রেল লাইনের ওপর নিয়ে এলাম সেই নিস্তেজ দেহ রেল লাইনের ওপর রেখে একখণ্ড কাপড় দিয়ে তার দেহ লাইনের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিলাম। তখন কোয়েটা মেল ট্রেন আসার সময় প্রায় হয়ে এসেছিল, আমি কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম কোয়েটা মেল ট্রেনটি হুইসেল দিতে দিতে বকরের দেহের ওপর দিয়ে চলে গেল। কিছুদূর গিয়ে ট্রেনটি থেমে গেল। তখন দেখলাম ট্রেনের লোকেরা আলো নিয়ে দৌড়াদৌড়ি ও চিৎকার করছে। আমি তখন সেখান থেকে উঠে সন্তর্পণে আরও দূরে গিয়ে ঘুমিয়ে রইলাম। পরদিন খুব ভোরে উঠে লার-কানায় চলে এলাম, তারপর কাম্বার হয়ে আমার নিজ গ্রামে ফিরে

Mamun Academy

এলাম।

পরবর্তী দুইমাস নিজ গ্রামেই থাকলাম। তারপর সেই ১৫০, টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার লারকানা রওনা হলাম। এবারও আমি এক প্যাকেট ধুতুরার বিষ সঙ্গে নিলাম।

আগের মতই আমি একটি দলের সঙ্গে মিশে তাস খেলায় যোগ দিলাম। বিকালের দিকে একে একে সকলেই খেলা শেষ করে চলে গেল। কেবল আমি ও আরেকজন অপরিচিত ব্যক্তি ওখানে বসে রইলাম। সে আমার পাশেই বসে ছিল। আমরা নিজেদের মধ্যে পরিচিত হলাম। সে জানাল যে সে দাদু জিলার বাসিন্দা। তার নামও আমাকে বলেছিল কিন্তু এখন আমি নামটা ভুলে গেছি।

আলাপে জানলাম যে সে এখানে এসেছে একজন উকিলের পরামর্শ নিতে। কারণ তার দেশে জমি-জমা নিয়ে গণ্ডগোল চলছে তখন আমি তাকে বললাম যে নিকটেই দুজন হিন্দু মেয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে আমার সঙ্গে পালাবার জন্যে। যদি সে আমাকে সে ব্যাপারে সাহায্য করে তবে একটি মেয়ে ও উভয়ের সম্পত্তির অর্ধেক তার এবং অপর মেয়েটি ও বাকি অর্ধেক সম্পত্তি আমার হবে। উত্তরে সে জানাল যে সে প্রথমে উকিলের কাছে তার কাজ সেরে পরে আমার সঙ্গে যেতে রাজি আছে।

আমরা উভয়ে তাজার বাগ থেকে উকিলের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। উকিলের বাড়িতে এসে লোকটি ভেতরে ঢুকে পড়ল। আমি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে সে উকিলের মুহুরীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল। এসে সে আমাকে বলল যে উকিলের সঙ্গে মামলার সব ব্যবস্থা সে করে এসেছে মুহুরীকে প্রয়োজনীয় টাকাও দিয়ে এসেছে। এখন সে আমার সঙ্গে

যেতে প্রস্তুত।

অতঃপর আমরা উভয়ে রওনা হলাম, প্রথমে একটা বাজারে এলাম। সেখান থেকে আমি রুটি ও রান্না করা কলজে কিনে নিয়ে আবার আমরা সেই পূর্বের রেল লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে সেই গম ক্ষেতের মধ্যে পৌঁছলাম।

খাবার জন্যে আমরা আগের মতই গম ক্ষেতের মধ্যে বসে গেলাম। আমি প্রথমে তাকে রুটি দিলাম ও পরে তার অজান্তে রান্না করা কলজের মধ্যে ধুতুরার বিষ মিশিয়ে দিলাম। তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও আস্তে আস্তে খেতে লাগলাম।

সে পেট ভরে রুটি ও বিষ মিশানো কলজে খেয়ে নিল। খাবার পরে আমি তাকে সিগারেট বের করে দিলাম। সিগারেটে কয়েকটা টান মেরেই সে মাতলামী শুরু করল। একটু পরেই মাটিতে ঢলে পড়ল। আমি তার পকেট হাতড়ে মাত্র কুড়ি টাকা পেলাম ও তা সরিয়ে রাখলাম। তারপর আমি তাকে টেনে রেল লাইনের ওপরে নিয়ে গেলাম এবং তার অজ্ঞান দেহ রেল লাইনের সঙ্গে কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেললাম। এবার আরও একটু দূরে সরে আবার সেই ট্রেন আসার অপেক্ষায় রইলাম।

শুক্কুর থেকে কোয়েটা মেল অল্পক্ষণ পরেই দ্রুতবেগে এসে পড়ল। লোকটির দেহের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে কিছুদূরে ট্রেনটি থেমে পড়ল। দেখলাম ট্রেনের যাত্রীরা আলো হাতে নেমে এসে দৌড়াদৌড়ি করছে। বুঝলাম, কেল্লা ফতে! আমি তখন বেশ দূরে ছিলাম তাই তাদের কথা-বার্তা শুনতে পাইনি।

সে রাত সেখানেই কাটিয়ে পরদিন ভোরে আমি লারকানায় ফিরে আসি।

Mamun Academy

পরদিন লারকানা থেকে আবার তাজের বাগে এলাম ও নতুন দলের সঙ্গে তাস খেলতে শুরু করলাম। এই দলেই ছিল আসামী মিনছরের তৃতীয় শিকার ওয়াহেদ বখশ যে ভাগ্যের জোরে অল্পের জন্যে মৃত্যুর-হাত থেকে উদ্ধার পায়। ট্রেন আসার ঠিক অল্পক্ষণ আগে তার অল্প অল্প জ্ঞান ফিরে আসে। আর সে নড়াচড়া করতে থাকে। ফলে তার শরীরের বাঁধন খুলে যায় আর সে লাইন থেকে নিচে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। ফলে সে আর ট্রেনে কাটা না পড়ে বেঁচে যায়।

পুলিশ আসামীকে গ্রেফতার করে সাক্ষরের জেলখানায় এক সনাক্ত মহড়ার ব্যবস্থা করল (Test Identification parade) উক্ত মহড়ায় কলজে বিক্রিকারী হোটেলওয়ালা কলন্দর এবং ওয়াহেদ বখশ সঠিকভাবে আসামী মিনছরকে সনাক্ত করল।

আসামী মিনছরকে দায়রায় সোপর্দ করা হয়। দুই ব্যক্তি খুনের অপরাধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৩০২ ধারামতে ও ওয়াহেদ বখশকে খুনের চেষ্টার অপরাধে ৩০৭ ধারামতে দায়রা বিচারক আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে ৩০৭ ধারায় তার সশ্রমকারাদণ্ডের ও ৩০২ ধারার অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

আসামী ৩০৭ ধারায় কারাদণ্ডের আদেশ মেনে নিলেও ৩০২ ধারার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টে আপীল দায়ের করে।

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিচার-বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে প্রথমোক্ত দুই জনকে খুন করার অপরাধ আসামীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়নি। কেবল আসামীর স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে আসামীর প্রাণদণ্ড দেয়া ঠিক হবে না, বিশেষ করে আসামীর স্বীকারোক্তিও প্রকৃত ঘট-

Mamun Academy

নার মাঝে বেশকিছু ফাঁক রয়েছে। হাইকোর্ট অতঃপর আসামীকে ৩০২ ধারার অপরাধ থেকে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দেন।

পশ্চিম পাকিস্তান সরকার উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে। সেখানে জাস্টিস হামিদুর রহমান তাঁর বিজ্ঞ রায়ে সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে হাইকোর্টের আদেশই বহাল রাখেন।

অতঃপর আসামী মিনহুরের কেবল মাত্র ওয়াহেদকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে কারাদণ্ডাদেশ হয়।

Mamun Academy

নাচোলের নৃশংস পুলিশ হত্যা

রাজশাহী জিলার সুদূর অভ্যন্তরে অবস্থিত নাচোল থানা, থানার একপ্রান্তে অবস্থিত ঘাসুয়া গ্রাম।

সেটা ১৯৫০ সাল। তখনও এই অঞ্চলে যাতায়াতের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। নাচোল থানা থেকে একটি দুর্গম আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তাই ছিল সে অঞ্চলে যাবার একমাত্র যোগসূত্র। আর সেই রাস্তায় পায়ে-হাঁটা বা গরুর গাড়িই ছিল একমাত্র বাহন। প্রধানতঃ সাঁওতালদের বাস এই গ্রামে।

১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বা তার কিছুদিন আগে থেকেই নাচোলথানায় অনবরত খবর আসতেথাকে যেঘাসুয়া অঞ্চলে কমিউনিস্টদের আনাগোনা খুব বেড়ে গেছে। তারা ওই অঞ্চলের সাঁওতালদের ক্ষেপিয়ে তুলবার চেষ্টা করছে আর নিরীহগ্রামবাসী যারা তাদের কথায় সায় দিচ্ছে না তাদের উপরে অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাচ্ছে। কমিউনিস্টরা নাকি সেই অঞ্চলের শাসনভার নিজেদের হাতে নেবার চেষ্টা করছে। আর জোর জবরদস্তি করে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কমিউনিস্ট ফাণ্ডে টাকা-পয়সা ও ধান-চাউল আদায় করছে।

নতুন রাষ্ট্রপত্তন, দেশ ভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়ে তখনও অধিকাংশ থানা পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা ব্যতি-

Mamun Academy

ব্যস্ত। তাই তখন এদিকে নজর দিতে বোধহয় একটু বিলম্বই হল। ফলে ওই আইন অমান্যকারীরা আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ পেল। তারা সমস্ত গ্রামবাসীদের কাছ থেকে লেভী ধান আদায় করতে শুরু করল।

অবশেষে ১৯৫০ সালের ৫ই জানুয়ারী ভোরে নাচোল থানার অফিসার ইন-চার্জ, থানার তিনজন সিপাই, তিনটি রাইফেল ও তাঁর নিজস্ব বন্দুক নিয়ে থানা থেকে গরুর গাড়িতে ঘাসুয়া গ্রামের দিকে রওনা হলেন। এই হতভাগ্য দলের সিপাই তিনজনের নাম ছিল,—শাহাদত আলম, তপেশ চন্দ্র আচার্য ও নওজেশ আলী। আর বড় দারোগার নাম ছিল মিঃ তফিজুদ্দিন আহম্মদ।

দীর্ঘপথ পেরিয়ে গ্রামে পৌছে একজায়গায় তারা দেখতে পেল যে গ্রামের অক্ষয় পণ্ডিতের খামারে ধান মাড়াই করা হচ্ছে। আর বদন ও ফেলু নামক দুজন যুবক সেই ধান ভাগ করে আলাদা করছে। এদের একটু দূরে সুরেন মণ্ডল ও বিপিন মণ্ডল নামে দুজন লোক একটি ঘরে মাটির দেয়াল তুলছিল আর তাদের ভাইপো প্রফুল্ল তাদের কাছেই দাঁড়িয়েছিল।

পুলিশদের গরুর গাড়ি এদের কাছে এসে থামল।

দারোগা সাহেবের ডাকে সুরেন ও বিপিন কাছে এগিয়ে এল।

'তোমাদের বাড়ি কোন গ্রামে?' দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

লম্বা সেলাম দিয়ে বিনীত ভাবে উত্তর দিল বিপিন, 'জি হুজুর, আমরা এ গাঁয়েই বাস করি।'

সুরেনও সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল বিপিনের কথায়।

'তা বেশ! তবে শুনেছি তোমাদের এখানে নাকি কিছু লোক গণ্ডগোল পাকাচ্ছে ও কৃষকদের উপর অন্যায় অত্যাচার করছে?'

বিপিন এবার দারোগা সাহেবের আরও কাছে এগিয়ে এল। চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল কাছাকাছি আর কোনও লোক আছে কিনা। তারপর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে চাপা গলায় বলল, 'তা আর কি বলব হুজুর, আমরা যে কার রাজ্যে বাস করছি তাই ত বুঝতে পারি না। শুনেছি আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এখানে তথাকথিত কমিউনিস্টরা আমাদের উপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে তা আর সরকার বাহাদুর দেখছে কোথায়?'

'কমিউনিস্ট! এখানে! এই পাড়াগাঁয়েও?' আঁতকে ওঠেন দারোগা সাহেব। 'কি হয়েছে খুলে বল শুনি,' বলে আরও কাছে ডেকে নেন সুরেনকে দারোগা সাহেব। 'হুজুর যদি অভয় দিন ত বলি। না হলে ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলেছি তা ওরা জানতে পারলে আমার ঘাড়ে আর মুণ্ড থাকবে না। আপনারা ত কালেভদ্রে আসেন এদিকের গ্রামে। আপনারা চলে গেলে কে আমাদের বাঁচাবে ওদের হাত থেকে? জানেন, কমিউনিস্টরা এখানেই আমাদের বিচার করে, জেল, জরিমানা এমনকি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে।'

'বল কি, হে? এতদূর এগিয়েছে তারা?' আশ্চর্য হন দারোগা সাহেব। 'তোমার কোনও ভয় নেই, সুরেন। তুমি সব খুলে বল। আমি অভয় দিচ্ছি ওরা তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

তারপর হাতের বন্দুক মাটিতে ঠুকে দারোগা সাহেব বললেন, 'এই যে দেখছ না ওদের শায়েস্তা করার জন্যেই ত থানা থেকে রাইফেল-ধারী তিন-তিনজন সিপাই নিয়ে এসেছি। দরকার হলে আরও আনব। পুলিশ-মিলিটারী দিয়ে এ অঞ্চল ছেয়ে ফেলব। কমিউনিস্টদের এত আস্পর্ধা! কিভাবে ওদের জব্দ করতে হয় তা আমাদের জানা আছে।'

এবার ভরসা পেয়ে সুরেন ইঙ্গিতে অক্ষয় পণ্ডিতের খামারের দিকে দেখিয়ে দারোগা সাহেবকে বলল, 'ওই যে দেখছেন দুজন লোক খামারের ধান ভাগ করছে, ওরা হল কমিউনিস্ট কর্মী বদন ও ফেলু। ওখান থেকে পার্টির জন্যে জোর জবরদস্তি করে তারা লেভী ধান উঠাচ্ছে।'

'কৃষকরা তাতে আপত্তি করছে না?'

'আপত্তি? বলেন কি? ওদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কি গ্রামের কারও আছে? তাহলে হয় তাকে নিঃস্ব অবস্থায় এ অঞ্চল ছাড়তে হবে অথবা তার জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হবে।'

'কি এতখানি বাড় বেড়েছে?' রেগে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন দারোগা সাহেব। সিপাইদের আদেশ দিলেন, 'তপেশ, আলম তোমরা এখনি ওই বদন ও ফেলুকে ধরে নিয়ে এস আমার কাছে।'

সিপাইরা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে বদন ও ফেলুকে ধরে নিয়ে এল দারোগার সামনে।

কাছেই ছিল খাগুয়া প্রাইমারী স্কুল। সকলকে নিয়ে সেখানে এসে দারোগা সাহেব স্কুলের মাঠে চেয়ার নিয়ে বসলেন।

বদন ও ফেলুর দিকে তাকিয়ে তিনি হেঁকে বললেন, 'কি হে, তোমরা ওখানে কার ধান আদায় করছিলে?'

'অক্ষয় পণ্ডিতের ধান। সে আমাদের সমিতিকে তার ধানের অংশ দান করেছে। তাই নিতে এসেছি আমরা।' মাথা তুলে নির্ভীক-ভাবে উত্তর দেয় বদন।

'অক্ষয় কি তোমাদের ধান দান করেছে, না তোমরা জোর করে তার ধান কেড়ে নিচ্ছ?' ধমকে জিজ্ঞেস করেন দারোগা সাহেব।

'আমরা মোটেই জোর করিনি। অক্ষয় স্বেচ্ছায় ধান আমাদের

Mamun Academy

পার্টিকে দান করেছে।'

'প্রমাণ দিতে পার তার ?'

'নিশ্চয়ই। আপনি অনুমতি দিলে এখনই অক্ষয়কেই ডেকে এনে হাজির করতে পারি আপনার সামনে। আর তাকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবেন আমি সত্যি বলছি কিনা।' বলল বদন।

'বেশ তাহলে অক্ষয়ের মুখ থেকেই শোনা যাক প্রকৃত ঘটনা। যাও অক্ষয়কে এখনই ডেকে আন এখানে।' হঠাৎ এই আদেশ দিয়ে ফেললেন দারোগা সাহেব ধূর্ত বদনকে। আর ছাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বদন এক দৌড়ে রওনা হল সেখান থেকে।

কিন্তু বদনকে স্বয়ং এই কাজে পাঠিয়ে দারোগা সাহেব যে কি বিরাট ভুল করে বসলেন তা তখন তাঁর খেয়ালে আসেনি। কিন্তু ভুল যখন বুঝলেন তখন দেরি হয়ে গেছে।

অক্ষয় পণ্ডিতের বাস ছিল নিকটবর্তী কেন্দুয়া গ্রামে। বদন প্রথমে সেই গ্রামের দিকেই রওনা হল। কিন্তু দারোগা সাহেবের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে, সে ঘুরে সোজা চলে গেল চান্দিপুর গ্রামের দিকে।

চান্দিপুর ছিল সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম ও কমিউনিস্টদের প্রধান আড্ডা। আর এই গ্রামেই ছিল পার্টির সর্ববৃহৎ ক্যাম্প ও হেড-কোয়ার্টার। পার্টির প্রধান নেতা ও কর্মীরা থাকত এখানেই।

দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বদন হাজির হল পার্টির এই ক্যাম্পে।

এখানে পেল তাদের প্রধান নেত্রী ও সংগঠনকারী সুশিক্ষিতা ইলা মিত্রকে। সাঁওতাল নেতা মাটলা মাঝিও তখন সেখানে হাজির ছিল।

বদনের কাছে তারা সব শুনল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নেতাদেরও

Mamun Academy

জরুরী তলব পড়ল সেখানে। খবর পেয়ে হাজির হল হবু মিত্র, অনিমেশ লাহিড়ী, আজাহার, বৃন্দাবন সাহা ইত্যাদি স্থানীয় নেতারা।

কিছুক্ষণ আলোচনা চলল তাদের মধ্যে। তাদের উৎসাহী কর্মী ফেলু তখনও দারোগা সাহেবের কাছে বন্দী। বদন আরও জানাল যে গ্রামের অনেক লোকও দারোগা সাহেবকে পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে সেখানে নালিশ করছে। এখনই একটা বিহিত না করলে তাদের সর্বনাশ হবে।

এরপরেই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে শোনা গেল সাঁওতাল প্রধান মাটলা মাঝির বাড়িতে রাখা বিরাট ঢোলকের ঘন ঘন গম্ভীর আওয়াজ। ঢোলকের সেই প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের সব সাঁওতাল পুরুষেরা ও কমিউনিস্ট কর্মীরা কাজকর্ম ফেলে হাতের কাছে যে যা অস্ত্র পেল তাই নিয়ে দৌড়ে এসে জড়ো হতে লাগল মাটলা মাঝির উঠনে।

এখানে বলা দরকার যে আগে থেকেই পার্টির নির্দেশ ছিল যে সর্দারের বাড়ির ঢোলের শব্দ শুনলেই বুঝতে হবে যে গ্রামে মহা বিপদ উপস্থিত, তাই সঙ্গে সঙ্গে সকল পুরুষকে সেখানে হাজির হতে হবে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে।

দেখতে দেখতে ২৫০ থেকে ৩০০ জন পুরুষ—প্রধানতঃ সাঁওতালেরা এসে জড়ো হল মাটলা মাঝির উঠনে। তাদের অনেকের হাতে তীর ধনুক সড়কি লাঠি, ঢাল, দা ইত্যাদি।

নেতারা বুঝিয়ে দিল যে এক মহা বিপদেই কর্মীদের ডাক পড়েছে আজ। বড় দারোগা স্বয়ং সিপাই নিয়ে গ্রামে হাজির তাদের সবাইকে ধরার জন্যে। আর এরমধ্যেই তাদের একজন বিশ্বস্ত কর্মী ফেলু

দারোগা সাহেবের হাতে বন্দী হয়েছে।

অতঃপর তাদের কি কর্তব্য তাও বুঝিয়ে দেয়া হল।

এর পরেই ওই শ তিনেক লোকের উত্তেজিত জনতা বানুয়া প্রাইমারী স্কুলের দিকে এগুতে লাগল চিৎকার ও হৈ-হল্লা করতে করতে। দলের সামনে নেতা মাটলা মাঝি, হবু মিত্র, অনিমেশ, আব্বাহার, বৃন্দাবন প্রমুখেরা। জনতা যতই সামনে এগুতে লাগল ততই তারা মারমুখি হয়ে উঠল। আশেপাশের মেয়ে এবং বাচ্চারাও এদের পেছনে জড়ো হয়ে দল আরও ভারি করে তুলল।

হৈ-হল্লা করতে করতে জনতা বানুয়াগ্রামেএসে পৌঁছল। একটি আমগাছ তলায় তারা অল্পক্ষণের জন্যে থামল, সেখানে আরও লোক এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। এবার দলে বহুগুণ ভারি হয়ে তারা আবার এগুতে লাগল পুলিশদের দিকে।

এই জনতা পুলিশ পার্টির মাত্র ২৫/৩০ হাত দূরে এসে থেমে গেল পুলিশ পার্টির উদ্যত রাইফেলের সামনে। কিন্তু সেখান থেকেই জনতা চিৎকার করতে করতে বিভিন্নধ্বনি দিতে লাগল পুলিশদের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ এরকম একটি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত বিরাট মারমুখি জনতা দেখে দারোগা সাহেব ও পুলিশেরা ঘাবড়ে গেল। সাঁওতালদের তীর-ধনুককেই তারা বেশি ভয় করত।

দারোগা সাহেব ভাবলেন এদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে একটা বোঝাপড়া করাই শ্রেয়। তখন তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ওদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা সবাই এরকম হল্লা করছ কেন এখানে এসে? পুলিশ তোমাদের বন্ধু। আমরা এসেছি গ্রামে শান্তি রক্ষারই জন্যে, তোমাদের কোন ক্ষতি করতে নয়। যদি তোমাদের কোন বক্তব্য থাকে, তবে তোমাদের কয়েকজনপ্রতিনিধি আমারকাছে পাঠিয়ে

Mamun Academy

দাও, আমরা আলোচনা করব। কিন্তু সবাই মিলে হল্লা করলে ত কোন কাজ হবে না।'

তখন সেই দলের একজন নেতা একটু এগিয়ে এসে দূর থেকে চিৎকার করে বলল, 'আমরাও আপনার সঙ্গে আলোচনাই করতে চাই, কিন্তু আপনার ঐ রাইফেলধারী সিপাইদের বিশ্বাস করতে পারছি না। গুলির ভয়ে আপনার দিকে আমাদের আর এগুতেই সাহস হচ্ছে না—আলোচনা করব কিভাবে?'

'আমি অভয় দিচ্ছি তোমাদের কোনও ভয় নেই। আমরা গুলি করব না।' উত্তরে বললেন দারোগা সাহেব।

'বেশ তাহলে আপনাদের বন্দুক ও রাইফেলগুলো দূরে একপাশে সরিয়ে রাখুন যাতে আমরা নির্ভয়ে আপনার কাছে আসতে পারি,' বলল দলের এক নেতা।

দারোগা সাহেবের হাতে ছিল তখন তাঁর বন্দুক, আর তিনজন সিপাইর হাতে গুলিভর্তি তিনটি রাইফেল।

দারোগা সাহেব সরল মনে ওদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে আরেক বিরাট ভুল করে বসলেন যার ফলে চরম মূল্য দিতে হল সমগ্র পুলিশ পার্টিকে। দারোগা সাহেবের আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিপাই তিনজন তাদের উদ্যত রাইফেল নামিয়ে রাখল নিচে।

কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হল না সেই জনতা।

তারা দাবি করতে লাগল যে রাইফেল ও বন্দুক দূরে একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে।

এ দাবিও মেনে নিয়ে দারোগা সাহেব তাদের বন্দুক ও রাইফেলগুলো কিছুটা দূরে স্কুলের দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে দিলেন।

Mamun Academy

এবার সাঁওতাল নেতারা এগিয়ে এল পুলিশ পার্টি'র দিকে। আর তাদের পেছনে পেছনে এগুতে লাগল সেই বিরাট জনতা।

নেতা অনিমেশ সবার অলক্ষে দৌড়ে এসে তিনটি রাইফেল ও বন্দুকটি হস্তগত করে ফেলল। এত তৎপরতার সঙ্গে সে এই কাজটি সমাধা করল যে পুলিশেরা তখন কিছু টেরই পেল না। হাতে হাতে করে নিমেষের মধ্যে রাইফেলগুলো অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলা হল।

সেই সঙ্গে হঠাৎ, অনিমেশ, আজাহার, বৃন্দাবন প্রমুখ নেতারা জনতাকে নির্দেশ দিল পুলিশদের ধরে ফেলতে। আর হাত ইশারায় পেছনের জনতাকে আহ্বান করল দ্রুত এগিয়ে আসতে।

ভীড়ের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে উঠল, 'আমরা এখানে সবাই স্বাধীন। পুলিশকে আমরা ভয় করি না। আজ এমন শিক্ষা দিতে হবে পুলিশকে যেন আর কোনদিন ওরা এ-মুখো না হয়।'

হঠাৎ ঘটনার এই পরিণতিতে পুলিশেরা ভীত ও হতভম্ব হয়ে গেল। তারা দৌড়ে গেল তাদের বন্দুক ও রাইফেল তুলে নিতে। কিন্তু হায়! সে স্থান তখন শূন্য, তাদের আত্মরক্ষার শেষ সম্বল অনেক আগেই উধাও হয়ে গেছে!

দেখতে না দেখতে উল্লাসের সঙ্গে সেই বিরাট হিংস্র জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র পুলিশ বাহিনীর উপরে। পুলিশদের তখন আর আত্মরক্ষার কোন পথই খোলা ছিল না, নিজেদের বোকামিতে তারা তাদের সে সম্বল আগেই হারিয়েছে।

দারোগা সাহেব দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তখন কে শোনে কার কথা। আজাহার দৌড়ে এসে দারোগার মাথায় সজোরে বসিয়ে দিল এক লাঠির ঘা। বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলেন দারোগা তফিজুদ্দিন মোল্লা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল

Mamun Academy

তাঁর মাথা থেকে। আশ্রয়ের আশায় তিনি অসহায়ভাবে পেছনের দিকে চাইলেন। কিন্তু হায়! এতক্ষণ তাঁর পেছনে কমিউনিস্ট বিরোধী যে কয়েকজন লোক ছিল, তারাও সবাই ভোজবাজীর মত নিমেষে উধাও হয়েছে। এখন দারোগার চারপার্শ্বে এমন একজনও রইল না যে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। বরং যারা এখন তাঁকে ঘিরে আছে-তারা সবাই মারমুখি হয়ে তেড়ে আসতে লাগল তাঁর দিকে। একমাত্র ইলা মিত্র বাদে জনতার আর প্রায় সবাই এই আক্রমণে ও মারধোরে অংশগ্রহণ করেছিল।

দারোগা সাহেব প্রাণের ভয়ে প্রথমে উত্তর দিকে দৌড় দিলেন পালাবার জন্যে, কিন্তু উন্মত্ত জনতা চিৎকার করতে করতে ধাওয়া করল তাঁর পিছু পিছু, ধরে ফেলল তারা দারোগা সাহেবকে। তারপর শুরু হল তাঁর উপরে বেদম প্রহার। আঘাতে আঘাতে তাঁর সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করে ফেলা হল। রক্তে ভেসে গেল তাঁর পোশাক আর সমস্ত শরীর। তাঁর হ্যাট, পুলিশব্যাজ, পোশাক সবই জনতা টেনে হেঁচড়ে কেড়ে নিল তাঁর শরীর থেকে। আঘাতে আঘাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর নিস্তেজ দেহ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তখনও চলল আরও মারপিট। অবশেষে যখন বোঝা গেল যে দেহে আর প্রাণ নেই তখন জনতা তাঁকে রেহাই দিল।

এবার দারোগাকে ছেড়ে জনতা পুলিশ কনস্টেবলদের খোঁজ করতে লাগল। দারোগার মত পুলিশেরাও প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল।

জনতা দেখল যে সিপাহিরা কেউ সেখানে নেই। তখন ভীড়ের মধ্য থেকে এক নেতার আদেশ শোনা গেল, 'যে ভাবেই হোক ওদের খুঁজে বের করতে হবে। একজনও যেন এই গ্রাম ছেড়ে যেতে

Mamun Academy

না পারে।'

সবাই চারদিকে খুঁজতে লাগল পুলিশদের। এমন সময় কে একজন খবর নিয়ে এল যে একজন সিপাই লুকিয়ে আছে বামা সুন্দরীর বাড়িতে।

সঙ্গে সঙ্গে একদল হিংস্র জনতা দৌড়ে গেল সেদিকে। দয়াবতী বামা সুন্দরীর সাহস হল না ওদের রুখতে। একবার মাত্র কাতরকণ্ঠে মিনতি করেছিল তার বাড়িতে না ঢুকতে। কিন্তু ধমক খেয়ে সে চুপ করে গেল। বামা সুন্দরীর ঘরের ভেতরে ঢুকে তার তক্তপোশের তলা থেকে টেনে বের করল জীবনের ভয়ে পালিয়ে থাকা একজন সিপাইকে। এদের হাতে পড়ে বলির পাঁঠার মত ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল সেই সিপাই আর কাকুতি-মিনতি করে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল সবার কাছে। কিন্তু কে শোনে তখন কার কথা! বেদম প্রহার করতে করতে তাকে নিয়ে আসা হল স্কুল ঘরে।

আরেকজন পুলিশ ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল শিবচরণ মণ্ডলের গোলাঘরে। জনতা খবর পেয়ে দৌড়ে গেল সেদিকে। তারা জোর করে ঢুকল শিবচরণের বাড়িতে। বৃথাই বাধা দেবার চেষ্টা করল তাদের শিবচরণ। বরং শিবচরণকে ভয় দেখানো হল যে পুলিশকে আশ্রয় দেবার চেষ্টা করলে তাকেও খুন করতে তারা দ্বিধা করবে না।

গোলাঘরের কোণ থেকে লুকানো পুলিশকে ধরে মারতে মারতে তারা নিয়ে এল স্কুল ঘরে।

তৃতীয় সিপাই রজনীকান্তের বাড়ির খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে াড়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু উন্মত্ত জনতা সেখান থকে তাকেও খুঁজে বের করে মারতে মারতে নিয়ে এল স্কুল ঘরে।

Mamun Academy

তিনজন সিপাই প্রাণভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল স্কুল ঘরে উল্লসিত জনতার টিটকারী ও গালাগালির সামনে।

এদিকে দারোগা তফিজুদ্দীন কিন্তু সত্যিই মরেননি। জনতা যখন তাঁকে মৃত মনে করে সিপাইদের নিয়ে ব্যস্ত তখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে তিনি নিকটবর্তী বামা সুন্দরীর বাড়িতে পৌঁছতে সক্ষম হন। তাঁর শরীরের অসংখ্য ক্ষত-স্থান দিয়ে দর দর করে রক্ত ঝরছিল।

করুণাময়ী বামা সুন্দরী ওই অবস্থায় দেখতে পেল দারোগা সাহেব-কে। এখানে বলা দরকার যে সেই হিংস্র লোকদের মধ্যে বামা সুন্দরীই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম।

ইঙ্গিতে দারোগা সাহেব বামা সুন্দরীর কাছে এক গেলাস পানি চাই-লেন। বামা সুন্দরী দৌড়ে গিয়ে পানি এনে দিল দারোগাকে। আর সভয়ে তাকাল সে চারদিকে কেউ দেখে ফেলে কিনা! পানির গেলাস নিঃশেষ করে দারোগা সাহেব তার কাছে কাতর কণ্ঠে একটু গোপন আশ্রয় ভিক্ষা করলেন অচিরেই—দেরি হলে ক্রুদ্ধ জনতা তাঁকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে ফেলবে।

জীবন ভয়ে ভীত এই আর্তের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না বামা সুন্দরী, যদিও সে জানত, এর ফলে কত বড় একটা ঝুঁকি সে নিতে যাচ্ছে। তার নিজের জীবন সংশয়ও হতে পারে।

সমস্ত ভয় উপেক্ষা করে মানবতার ডাকে এগিয়ে এল সে। হাত ধরে গোপনে বামা সুন্দরী দারোগাকে নিয়ে এল নিজের ঘরের মধ্যে। তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে মারাত্মকভাবে আহত দারোগার শুশ্রূষা করতে লাগল এই মানব দরদী মহিলা।

এদিকে স্কুলের কাছাকাছি জায়গা যেখানে দারোগাকে মৃত বলে

সবাই রেখে গিয়েছিল. সেখান থেকে দারোগার লাশ নিয়ে যেতে এল কয়েকজন দলীয় কর্মী। কিন্তু এসে দেখল যে সেখানে লাশ নেই। আশেপাশে খুঁজতে লাগল তারা লাশ। সবাই ভেবেছিল যে দারোগা ওখানেই মরে পড়ে আছে। তাহলে লাশ গেল কোথায় ? শেষ পর্যন্ত রক্তের দাগ লক্ষ্য করে এগুতে এগুতে তারা এসে উপস্থিত হল বামা সুন্দরীর বাড়িতে। দেখল রক্তের দাগ দরজা পার হয়ে একেবারে ঘরের ভেতরে চলে গেছে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

খবর পেয়ে অনেক লোক ছুটে এল বামা সুন্দরীর বাড়িতে। জোর চিৎকার ও আঘাত করতে লাগল সবাই দরজায়। প্রাণের ভয়ে বাধ্য হয়ে বামা সুন্দরী দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অসহায় বামা সুন্দরীকে ঠেলে ওরা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। এবারও খাটের তলা থেকে খুঁজে বের করল অর্ধমৃত দারোগা সাহেবকে। 'তাহলে দেখছি দারোগা সাহেব এখনও বেঁচে আছেন ?' টিটকারী দিয়ে বলে উঠল একজন।

'বেশ ভালই হল, এবার একসঙ্গেই সবার ব্যবস্থা করা যাবে,' বলল আরেকজন। হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষা চাইলেন দারোগা সাহেব। তার কাতর প্রার্থনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে হৈ-চৈ করতে করতে আধমরা দারোগাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলল তারা স্কুলের দিকে। আর অসহায় বামা সুন্দরী অশ্রু সজল চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে। মনে মনে বলল, 'পারলাম না আজ হিংস্র উন্মত্ত ওদের হাত থেকে একে রক্ষা করতে !

পুলিশ, দারোগা সবাইকে স্কুল ঘরে হাজির করে সেখানে নেতারা এক বিচার সভায় বসে গেল। বিচারের সেই প্রহসনে পুলিশ পার্টির চারজনের সবাইকেই প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়া হল।

এই আদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে জনতা ওখানেই আবার আঘা-

Mamun Academy

তের পর আঘাত করতে লাগল চারজন আহত বন্দী পুলিশকে। আত্মরক্ষার কোন উপায়ই তখন আর তাদের ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এবার কিন্তু ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হল চারজনই সত্যি-সত্যি মরেছে কিনা। ক্ষতবিক্ষত লাশগুলো নেড়ে, চেড়ে উল্টেপাল্টে দেখা গেল যে কেউ আর নড়ছে না— সবই নিস্তেজ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ। তখন সবাই নিশ্চিন্ত হল যে এরা সত্যিই মরেছে।

ওই অঞ্চলের মৃত সাঁওতালদের কবর দেয়া হত 'মরা পুকুর' নামে পরিচিত একটি নিচু স্থানে। ঠিক হল মৃত পুলিশদেরও ওখানেই কবর দেয়া হবে।

একটি গরুর গাড়ি এনে তাতে চারজনের লাশই উঠানো হল। তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে চলল গাড়োয়ান 'মরা পুকুরের' দিকে। পার্টির কয়েকজন সাঁওতালও গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল পাহারাদার হিসাবে। মাটি খুঁড়বার জন্যে কোদালও সঙ্গে নেয়া হল।

ওদের মধ্যে একজন কনস্টেবল, শাহাদত আলম কিন্তু সত্যিই মরেনি। গাড়ির ঝাঁকুনিতে তার জ্ঞান ফিরে এল। সে চেয়ে দেখল তার পাশেই সহকর্মীদের মৃত লাশের মধ্যে সে-ও পড়ে আছে। তাদের কারও দেহেই জীবনের লক্ষণ নেই।

বাঁচবার দুরন্ত আশায় শাহাদত আর একবার শেষ চেষ্টা করতে মনস্থ করল। সমস্ত শরীর তার ক্ষত-বিক্ষত। এক সময় দেখতে পেল সে তাদের গাড়ি একটি ঝোপের পাশ দিয়ে চলছে। শাহাদত সেই সুযোগে গাড়ি থেকে এক ঝোপের পাশে নেমে পড়ে পালাবার আশায় দিল দৌড়। কিন্তু পেছনের পাহারাদার সাঁওতালেরা দেখে ফেলল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করতে করতে কোদাল উঁচিয়ে

Mamun Academy

তার পিছু ধাওয়া করল তারা। প্রাণপণে ছুটতে লাগল শাহাদত। কিন্তু ভাঙা হাত-পা নিয়ে বেশিদূর যেতে পারল না। হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালেরা দৌড়ে এসে কোদাল দিয়ে তার ভবলীলা ওখানেই সাঙ্গ করে দিল।

'একে আর টানাটানি করে মরা পুকুরে নিয়ে গিয়ে কি হবে? একে এখানেই কবর দেয়া যাক.' একজন বলল। যেই কথা সেই কাজ। সেখানেই কোদাল দিয়ে কবর খুঁড়ে শাহাদতকে তারা মাটি চাপা দিল।

বাকি তিনটি লাশ নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে তারা মরা পুকুরে পৌঁছল।

দুটি কবর খোঁড়া হল মরা পুকুরে। একটিতে কবর দেয়া হল দারোগা তফিজুদ্দিন মোল্লা ও সিপাই নওজেশকে, আর অন্যটিতে তারা সিপাই তপেশকে মাটি চাপা দিল।

এদিকে যে গাড়োয়ান পুলিশ পার্টিকে নিয়ে থানা থেকে এসেছিল, সে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে দূর থেকে দেখেছিল পুলিশদের উপর প্রথম মারপিটের দৃশ্য। সেখানে আর দেরি না করে সে সকলের অজান্তে গাড়ি গরু ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তারপর সে সোজা ছোটে নাচোল থানার দিকে। পরদিন বিকাল তিনটার সময় সে অতিকষ্টে আধমরা অবস্থায় এসে পৌঁছল নাচোল থানায়।

পুলিশ ইন্সপেক্টর হাবিবুর রহমান ছিলেন তখন থানায়। গাড়োয়ান হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তাকে বলল, 'হুজুর, সর্বনাশ হয়েছে! বোধহয় এতক্ষণ বড়বাবু ও সিপাইরা সব শেষ হয়ে গেছে।'

এটুকু বলেই গাড়োয়ান অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তাড়াতাড়ি মাথায় পানি ঢেলে সুস্থ করে তোলা হল তাকে। এবার

Mamun Academy

সে সব ঘটনা বিস্তারিত বলল ইন্সপেক্টর সাহেবকে। আর কাতর-কণ্ঠে বলল,'বোধহয় এখনও গেলে দু'একজনকে প্রাণে বাঁচানো যেতে পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর সাহেব যে সমস্ত পুলিশ, চৌকিদার ও অস্ত্র-শস্ত্র তাঁর হাতের কাছে পেলেন তাই নিয়েই দেরি না করে রওনা হলেন ঘাসুয়া গ্রামে।

সারারাত চলল তাদের মোষের গাড়ি। পরদিন ভোরে পৌঁছল তারা সেই গ্রামে।

এবারও সাঁওতালেরা তাদের দেখে দূরে থেকে শাসাল। বলল প্রাণে বাঁচতে চাইলে তারা যেন সেই মুহূর্তেই গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যায় সেই গ্রাম থেকে। না হলে তাদেরও বিপদ আছে।

কিন্তু সতর্ক, সাহসী ইন্সপেক্টর সাহেব ওদের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে রাইফেল উঁচিয়ে ঢুকে পড়লেন গ্রামে। তারপর তাঁর সশস্ত্র পুলিশের সাহায্যে কয়েকজন আসামীকেও গ্রেফতার করতে সক্ষম হলেন। আর অনেকেই বিপদ দেখে পলাতক হল।

সেই গ্রামে বসেই সংগে সংগে ইন্সপেক্টর ঘটনার তদন্ত শুরু করলেন। শুরুতেই সুকুর কামার নামক এক সাঁওতালকে গ্রেফতার করলেন তিনি। তাকে জেরা করে পুলিশ অফিসার কয়েকটি দামী খবর সংগ্রহ করলেন। সেই খবরের সূত্র ধরে তিনি সুকুর কামারের বাড়িতে গিয়ে তার নির্দেশ মত তারই ঘরের মেঝের এক জায়গা খুঁড়ে মাটির নিচ থেকে পেলেন পুলিশের তিনটি স্টীল হ্যাট, একটি রাইফেল রাখার চামড়ার ব্যাগ, একটি পুলিশের খাকি সার্ট ও পুলিশ-দের ব্যবহৃত আরও কয়েকটি ছোট ছোট জিনিস।

সুকুর কামার পুলিশকে এরপর আরেক জায়গায় নিয়ে গেল।

Mamun Academy

সেখান থেকে পুলিশ পার্টির আরও কয়েকটি জিনিস পাওয়া গেল, সেগুলোর মধ্যে ছিল দুটি E. P. P. লেখা পিতলের পুলিশ ব্যাজ।

পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে জরুরী তলব পেয়ে দুদিনের মধ্যেই রাজশাহী ও অন্যান্য স্থান থেকে বহু সশস্ত্র পুলিশ ও অফিসার এসে পৌঁছল ঘানুয়া গ্রামে। ইতিমধ্যেই ইন্সপেক্টর হাবিবুর রহমান সেই গ্রামে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প গেড়ে বসলেন। এদিকে গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ মানুষই হল পলাতক।

ঘটনার দুদিন পরে সাব-ইন্সপেক্টর দবিরুদ্দিন সুফল মাঝি নামক একজন সাঁওতালকে গ্রেফতার করে আনলেন। তার সূত্রে খবর পেয়ে পর পর আরও কয়েকজন পলাতক আসামীকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা হল।

এদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে দবিরুদ্দিন সাহেব 'মরা পুকুর' থেকে মাটি খুঁড়ে তিনটি লাশ উদ্ধার করলেন। তার মধ্যে একটি ছিল হতভাগা দারোগা তফিজুদ্দিন সাহেবের। আর অন্য দুইটি ছিল সিপাই নওজেশ ও তপেশচন্দ্র আচার্যের লাশ। প্রতিটি লাশেই অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। যা দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে কত নির্দয়ভাবে প্রহার করে এদের হত্যা করা হয়েছিল।

অন্য সূত্রে খবর পেয়ে সাব-ইন্সপেক্টর বদরুল আলম নিহত কন্‌স্টেবল শাহাদত আলমের বিকৃত লাশ উদ্ধার করল শ্যামপুর গ্রামের একটি খালপাড়ের গর্ত থেকে।

উদ্ধারের পরে সবগুলি লাশই ময়না তদন্তের জন্যে সদরে পাঠানো হল।

লাশ উদ্ধারের পরও কিন্তু রাইফেল ও বন্দুকের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। অতঃপর সেগুলো উদ্ধারের জন্যে পুলিশ কয়েক-

দিন ধরে জোর তদন্ত চালাতে লাগল। অবশেষে ১০ই জানুয়ারী (১৯৫০ সাল) চান্দিপুরের নিকটবর্তী নাপিতপাড়া গ্রামের একটি পুরনো ডোবা পুকুরের তলা থেকে উদ্ধার করা হল পুলিশের তিনটি হারানো রাইফেল ও নিহত দারোগা সাহেবের সখের নিজস্ব বন্দুকটি।

এদিকে পুলিশ ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অধিকাংশ নায়কদেরই গ্রেফতার করতে সক্ষম হল আশপাশের গ্রাম থেকে। কিন্তু পাওয়া গেল না কেবল নেত্রী ইলা মিত্রকে ও আর এক নেতা বৃন্দাবনকে।

ওরা দুজনে কিন্তু ঘটনার পর গরুর গাড়িতে পুলিশের লাশ 'মরা পুকুরে' নিয়ে যাবার পরই নিজেরাও সেই রাতেই রওনা দেয় গ্রাম ছেড়ে। ভারতে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে তারা বন-জঙ্গল ভেঙে সোজা রোহনপুর স্টেশনের দিকে রওনা হয়। পুলিশ বেষ্টনীর আগেই তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। যখন তারা রোহনপুর রেল স্টেশন থেকে ভারতমুখী ট্রেনে উঠতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে একটি পুলিশ পার্টি এসে তাদের দুজনকেই গ্রেফতার করল। আর একটু দেরি হলেই এদের আর ধরা সম্ভব হত না।

এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার করেন রাজশাহীর তৎকালীন জিলা ও দায়রা জজ জনাব এস. আহম্মদ।

স্পেশাল জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে মামলার তেইশ জন আসামীকে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন।

Mamun Academy

লীনা

অতি ভোরে শঙ্কিত চিত্তে রওনা হল লীনা তার ফোর্ড গাড়িটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের ডেট্রয়েটের বাসা থেকে। বহুদূরে যেতে হবে তাকে, ভিন্ন স্টেটে নিজ গ্রামের বাড়ি কেনটাকী হিল্‌সে।

প্রশস্ত রাজপথ ধরে তীরবেগে ছুটে চলল তার গাড়ি। ড্রাইভিং সীটে একলা বসা গাড়ির একমাত্র আরোহী ২৮ বৎসরের সুন্দরী যুবতী লীনা। গাড়ির পেছনের সীটে গুছিয়ে রাখা আছে লাল কাগজে মোড়া নীল ফিতা দিয়ে সযত্নে বাঁধা অনেকগুলো প্যাকেট। সেটা ছিল ১৯৪৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর। সামনেই ক্রিস্টমাস দিবস। দেখে মনে হচ্ছিল কতগুলো উপহারের প্যাকেট নিয়ে লীনা যাচ্ছে শহর থেকে তার গ্রামের বাড়িতে ক্রিস্টমাস উৎসব পালনের জন্যে।

বাসা থেকে অনেক পথ চলে এসেছে সে। তার গ্রাম আর বেশি দূরে নয়। কোথাও একটু নির্জন জঙ্গল পেলেই সেখানে থেমে সে তার কাজ সমাধা করে তবে নিশ্চিত হবে। চলতে চলতে পেছনের সীটে রাখা সুন্দর কাগজে মোড়ানো প্যাকেটগুলোর দিকে সে তাকিয়ে দেখল। হ্যাঁ, এবার আর তাকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না, ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। কিন্তু তখন কি সে ক্ষণিকের জন্যেও ভাবতে পেরেছিল যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন তাকে করতেই হবে? আপাততঃ সবার কাছে গুরুতর অপরাধ লুকাতে পারলেও, অলৌকিক-

Mamun Academy

ভাবেই অনেক সময় প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে যায় ?

যদিও তার ফোর্ড গাড়িটি প্রায় নতুনই ছিল, কিন্তু ওহাইও রাজ্যের টলেডোতে এসে পড়তেই সেটা হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ল। নেমে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও লীনা তা ঠিক করতে পারল না। অবশেষে সে অন্য একটি গাড়ির সাহায্যে ওটাকে টেনে নিয়ে এল নিকটবর্তী একটি গাড়ি মেরামতের গ্যারেজে। সেখানে মেকানিক গাড়িটি পরীক্ষা করে জানাল যে ওটা মারাত্মকভাবে বিকল হয়েছে, অনেক খাটতে হবে; সম্পূর্ণ ঠিক করে আবার চালু করতে পুরো দু'দিনের আগে হবে না।

গ্যারেজের মালিক গাড়িটি তার গ্যারেজে রেখে ওই সময় নিকট-বর্তী একটি হোটেলে থাকতে উপদেশ দিল লীনাকে। একথা শুনে আকাশ ভেঙে পড়ল লীনার মাথায়। গাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। সে গাড়িটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে বলল যে ওটা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সে তার গাড়ির সামনের সীটেই রাত কাটাবে।

দ্বিতীয় দিনেই একটা পচা দুর্গন্ধ সেই গাড়ি ও গ্যারেজের আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়ল। দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে খুঁজতে গ্যারেজের মালিক বুঝতে পারল যে লীনার গাড়ির ভিতর থেকেই গন্ধ আসছে। এর কৈফিয়ত স্বরূপ লীনা জানাল যে তার গাড়ির পেছনে রাখা প্যাকেটগুলোতে আছে শিকার করা হরিণের মাংস। তার স্বামী জঙ্গল থেকে দুটি হরিণ শিকার করেছিল। সেই মাংসই সে গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছিল তার গ্রামের বাড়িতে বড়দিনের উপহার হিসাবে। আত্মীয়-স্বজনকে বিতরণ করবে। পথে গাড়ি বিগড়ে গিয়ে হয়েছে যত বিপদ, না হলে কখন সে পৌঁছে যেত বাড়িতে।

দুদিনেও কিন্তু গাড়িটি ঠিক করা গেল না। এদিকে দুর্গন্ধ আরও বাড়তে শুরু করল। অতিষ্ঠ হয়ে গ্যারেজের মালিক লীনাকে বলল, 'ওই পচা মাংস আর টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কি? এর দুর্গন্ধে আপনারই ত বেশি অসুবিধা হচ্ছে। এই মাংস এখানেই ফেলে দেয়া ভাল।'

এই প্রস্তাব শুনে লীনার মুখ এতটুকু হয়ে গেল। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সে উত্তর দিল, 'দেখুন আমার স্বামীর খুব সখের শিকার এগুলো। যে ভাবেই হোক এ মাংস আমাকে আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। পচে গেলেও আমি তা ফেলে দিতে পারব না।' এরপর মিনতি করে সে বলল, 'দয়া করে আমার গাড়িটি তাড়াতাড়ি মেরামত করে দিন না!'

২৩শে ডিসেম্বরের মধ্যেই গাড়িটির মেরামত প্রায় সম্পূর্ণ হল। সেই দিনই বিকালের মধ্যে লীনা রওনা হতে পারবে বলে আশা করা গেল।

কিন্তু এর মধ্যে দুর্গন্ধ আরও বেড়ে গেল। তা ছাড়া লীনার হাব-ভাবেও অনেকের সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। গাড়ির ভেতরের দিকে সে কাউকেই আসতে দিত না। এ কদিন সে গাড়ি ছেড়েও সহজে বাইরে যেতে চায়নি। গাড়িতে বসেই সে শুকনো খাবার খেয়ে নিয়েছে। আর অসহ্য ওই দুর্গন্ধের মধ্যেই সে সামনের সীটে রাত্রি কাটিয়েছে।

এ সব দেখে গ্যারেজের কর্মচারীদের সন্দেহ বেড়ে গেল। তাদের মনে হল লীনা যেন কোন রহস্য গোপন করার চেষ্টা করছে।

সেদিন দুপুরে লীনা গাড়িতে বসেই কিছু স্যাণ্ডউইচ ও মদ খেয়ে গাড়ির সামনের সীটে বিশ্রামের জন্যে শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত লীনা অল্প-

ক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। ওকে ঘুমাতে দেখে গাড়ি মেরামতকারী একজন তরুণ কৌতূহলী হয়ে গোপনে পেছনের সীট থেকে একটি প্যাকেট তুলে নিল। বিকট দুর্গন্ধ আসছিল সেটা থেকে। বাইরে এনে সেটা খুলতেই তার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে উঠল। প্যাকেট থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষের কাটা পা—হাঁটু থেকে নিচের পায়ের অংশটি! মাংস পচে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল সেটা থেকে। ভীত হয়ে সে দৌড়ে গিয়ে তার সহকারী ও মালিককে দেখাল সেই প্যাকেট। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেয়া হল।

যখন পুলিশ এসে পৌঁছল তখনও কিন্তু লীনা তার গাড়ির সামনের সীটে গভীর ঘুমে মগ্ন। তাকে জাগিয়ে পুলিশ তার পিছনের সীটের রঙীন কাগজে মোড়া সবগুলো বাণ্ডিল টেনে বের করল। খুলে দেখা গেল একজন মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড়ান সে সব প্যাকেটে।

এ ভাবে হাতে নাতে ধরা পড়ে লীনা পুলিশের নিকট শেষ পর্যন্ত তার সব দোষ স্বীকার করে জানাল যে এগুলো তার স্বামী হাউস-ডেনের মৃতদেহের বিচ্ছিন্ন অংশ। সে নিজ হাতে স্বামীকে খুন করে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে আলাদা প্যাকেটে জড়িয়ে গ্রামের কাছে জঙ্গলে নিয়ে চলছিল ওগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলার জন্যে। সমস্ত ঘটনার যে রোমহর্ষক বিবরণ পুলিশ সংগ্রহ করল তা হল:

২৯ বৎসর বয়স্ক তার স্বামী হাউসডেন ছিল একজন বাস ড্রাইভার। ডেট্রয়েটের হাইল্যাণ্ড পার্কের নিকটে একটি ছোট বাসাতে থাকত তারা দুজন। কোন সন্তানাদি হয়নি তখনও তাদের। সুন্দর কালো দুটি চোখের অধিকারিণী লীনার সুন্দরী হিসাবে বেশ খ্যাত ছিল। তার ভ্রমর-কালো চোখের ভ্রূকুটিতে পতঙ্গের ন্যায় বহু পুরুষ আত্ম

ছুটি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সুন্দরী লীনা বহু বল্লভা হতে চায়নি। সে কেবল চেয়েছিল যে তার স্বামী একান্তভাবে তারই থাকবে। অন্য কোন মেয়েলোকের সঙ্গে হাউসডেন মেলামেশা করুক সেটা মোটেই তার পছন্দসই ছিল না। কিন্তু হাউসডেন ছিল হৈ-চৈ করা আমুদে লোক, মদ্যপান ছিল তার প্রিয় নেশা। প্রতিদিন কাজের শেষে এক-বার ক্লাবে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হৈ-চৈ ও মদ্যপান না করলে তার জীবনই ব্যর্থ বলে মনে হত। ফলে প্রায়ই সে গভীর রাত পর্যন্ত ক্লাবে কাটাত, তারপর যখন বাসায় ফিরত, তখন লীনা প্রতি রাত্রেই তার সঙ্গে এক কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলত।

লীনা ভাবে—বিয়ের পর পর তার স্বামী ত এ রকম ছিল না। প্রথম কয়েকটি বছর স্বপ্নের মত কেটে গেছে তাদের অতি সুখের দাম্পত্য জীবন। উভয়েই তখন পরস্পরের সঙ্গ সুখ লাভের জন্যে ব্যগ্র। সারাদিনের কাজ সেরে হাউসডেন ফিরত তাদের ছোট্ট বাসায়। স্ত্রী লীনাও গভীর আগ্রহের সঙ্গে স্বামীর আগমনের জন্যে অপেক্ষা করত। দু'হাত বাড়িয়ে সে অভ্যর্থনা জানাত কর্মক্লান্ত স্বামীকে। তার-পর উভয়ে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করত তাদের সুখী দাম্পত্য জীব-নের প্রতিটি অবকাশ মুহূর্ত।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে লীনার মনে সন্দেহের উদ্রেক হল যে তার স্বামী যেন আর আগের মত তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না। সে মদে চুর হয়ে দেরি করে ক্লাব থেকে ফেরে। এর উপর আরও একটি সন্দেহে সে স্বামীর প্রতি ভয়ানক বিরূপ হয়ে উঠল; তার ধারণা হল স্বামী কুসংসর্গে পড়ে অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত হয়ে উঠেছে এবং সেখানেই সে রাতের অধিকাংশ সময় কাটায়।

লীনা ছিল ভয়ানক রাগী ও জেদী মেয়ে। রাগের মাথায় সে না

Mamun Academy

করতে পারত এমন কাজ ছিল না। তার স্বামী তাকে ছেড়ে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে এ ছিল তার কাছে অসহনীয়। হাউসডেন কিন্তু লীনাকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে তার ধারণা অমূলক। যদিও ক্লাবে আড্ডা দেয়া, অল্প-স্বল্প মদ খাওয়া অনেকটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তবুও সে মোটেই চরিত্রহীন নয় বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের সংসর্গে যায় না। তাছাড়া সপ্তাহে সে উপার্জন করে মাত্র ৬৫ ডলার। তাই দিয়েই সংসারের খরচ চালাতে হয়। সেই টাকা থেকে আবার দেহপসারিণীদের পেছনে খরচ করার মত বিলাসিতা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ-ব্যাপারে স্ত্রী তাকে অহেতুক সন্দেহ করছে।

Mamun Academy

স্বামীর সে কৈফিয়ত কিন্তু লীনার কাছে অরণ্যে রোদনেরই সামিল হল। রগচটা লীনা কিছুতেই তার সে যুক্তি মেনে নিল না। তার ধারণা হল যে তার স্বামী চরিত্রহীন, তাকে উপেক্ষা করে সে অন্য কোন রমণীকে তার ভালবাসা বিলায়। এই নিয়ে প্রতিদিনই স্ত্রীর অভিযোগ ও ভৎর্সনা শুনতে শুনতে ঠাণ্ডা মেজাজের হাউসডেনও অস্থির হয়ে উঠল। বাসায় আর টিকতে না পেরে কয়েকবারই সে বাধ্য হয়ে অন্যত্র গিয়ে থাকতে শুরু করল—এই ভেবে যে, সাময়িক বিচ্ছেদে তার স্নায়বিক রোগগ্রস্ত স্ত্রী হয়ত একটু ঠাণ্ডা হবে আর সেই সঙ্গে সে-ও অনবরত ভৎর্সনা থেকে রেহাই পাবে।

কিন্তু সেই বিচ্ছেদ কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। প্রতি-বারই লীনা গিয়ে হাজির হয়েছে হাউসডেনের আস্তানায়। অনুতপ্ত হৃদয়ে সে দুঃখ প্রকাশ করেছে স্বামীর কাছে তার রূঢ় স্বভাবের জন্যে আর সেই সঙ্গে কথা দিয়েছে যে এরপর আর কখনও সে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করবে না বা তাকে সন্দেহ করবে না। স্বামীকে সে

সত্যিই ভালবাসত, স্বামী বিচ্ছেদও তার কাছে ছিল অসহনীয়।

এদিকে হউসডেনও কিন্তু তার স্ত্রীকে সত্যিই ভালবাসত আবার সেই সঙ্গে উগ্র স্বভাবের কারণে তাকে ভয়ানক ভয়ও করত, বিশেষ করে রাত্রে যখন লীনা ঝগড়াঝাঁটি ও চিৎকার করে পাড়াপড়শীদের জাগিয়ে তুলত তখন। আবার যতবারই স্ত্রী অনুতপ্ত হয়ে তাকে ঘরে ফিরে আসতে অনুরোধ করেছে স্বামী কোনবারই সেই অনুরোধ ফেলতে পারেনি, স্ত্রীর হাত ধরে আবার সে ফিরে এসেছে বাসায়। ভেবেছে এরপর থেকে লীনা হয়ত সত্যিই নিজের কথা রাখবে ও শান্ত হবে।

কিন্তু সব আশা বৃথা। ক'দিন যেতে না যেতেই লীনা আবার নিজ মূর্তি ধারণ করত, ভুলে যেত তার পূর্বের প্রতিশ্রুতি। আবার স্বামীর প্রতি সন্দেহযুক্ত হয়ে সে সামান্য কারণেই তার সঙ্গে অসহনীয় রূঢ় ব্যবহার করত ও গালিগালাজ করত। হাউসডেন ভাবত এরকম হবে জানলে সে কিছুতেই ঘরে ফিরে আসত না। তার স্ত্রীর সুন্দর মুখের মিষ্টি কথার মধ্যে কি প্রবঞ্চনাই না লুকিয়ে ছিল! কাজে গিয়েও হাউসডেনের শান্তি ছিল না, লীনার সন্দেহ হত কাজের অজুহাতে তার স্বামী বোধহয় বদ মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটায়। তাই সে ঘন ঘন হাউসডেনের কর্মস্থলে ফোন করে তার গতিবিধি সম্বন্ধে জানতে চাইত। এতে হাউসডেনের কাজে অহেতুক বিঘ্ন সৃষ্টি হত। সে সহকর্মীদের নিকটও ঠাট্টার পাত্র হয়ে উঠত।

অবশেষে মরিয়া হয়ে হাউসডেন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করল। সে স্ত্রীর বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করে কোর্ট থেকে স্ত্রীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল যে স্বামীর কর্মস্থলে সে আর ফোন করে তার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না।

কোর্টের এই নিষেধাজ্ঞা পাবার পর লীনা আরও ক্ষেপে গেল।

মারমুখী স্ত্রীকে আয়ত্তে আনার আর কোন উপায় না দেখে অবশেষে হাউসডেন স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু করল কোর্টে। স্ত্রী লীনা স্বামীর এই চরম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভয়ানক আপত্তি তুলল। সে অনেক চেষ্টা করল স্বামীকে বিবাহ বিচ্ছেদের কেস উঠিয়ে নিতে। কিন্তু হাউসডেন কয়েকবারই প্রতারিত হয়ে এবারে আর ভুল করতে রাজি হল না। সে স্ত্রীর কথায় আর কর্ণপাত করল না।

এতে লীনা আরও মারমুখি হয়ে উঠল। তার স্বামী তাকে ছেড়ে অন্য মেয়ে নিয়ে ঘর করবে, এটা লীনা কোনমতেই মেনে নিতে রাজি নয়। একে রুখতে সে যে-কোন চরম ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত হল।

এদিকে তালাকের মামলাটি কোর্টে চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌছাল। হাউসডেন অন্যত্র থাকে, সেখান থেকেই মামলা চালাতে লাগল। কিন্তু মামলা নিষ্পত্তির কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। এ অবস্থায় লীনা মরিয়া হয়ে মনে মনে এক দুঃসাহসিক ফন্দী আঁটল আর সে একাই তা কার্যকরী করবে বলে স্থির করল। সামনের ১৮ই ডিসেম্বর ছিল তাদের বিবাহ-বার্ষিকী তার কয়েকদিন পরেই ক্রিস্টমাস। এই দুই উৎসব উপলক্ষে লীনা কিছু কেনাকাটা করে নিল। ক্রিস্টমাসের উপহার প্যাক করার সুন্দর লাল রঙের কাগজ এবং নীল ফিতাও সে অনেক পরিমাণে কিনে ফেলল। তারপর ঘরে এসে সে তার স্বামীকে একটি প্রেমপূর্ণ পত্র লিখে একান্তভাবে তাকে সামনের ১৮ই ডিসেম্বরের বিবাহ বার্ষিকীতে আসবার জন্যে আহ্বান জানাল। ওই বিশেষ দিনটি উপলক্ষে তাদের বিবাহিত জীবনের মধুর দিনগুলো স্মরণ করে তার স্বামী অন্তত একটি রাত্রির জন্যে অবশ্য যেন তার ফ্ল্যাটে আসে। সে স্বামীকে ঘনিষ্ঠভাবে পেতে চায়। সে রাত্রে স্বামীর জন্যে সে প্রচুর মদ, খাবার ও অন্যান্য আনন্দের ব্যবস্থা করে রাখবে।

Mamun Academy

বিবাহ-বিচ্ছেদের আগে স্বভাবতই ক্রুদ্ধ স্ত্রীর কাছ থেকে এ ধরনের একটি আহ্বান পেয়ে হাউসডেন বেশ কৌতুক বোধ করল। ওই আহ্বানে সে সাড়া দেবে কিনা তাই নিয়ে মহা ভাবনায় পড়ল। বলা যায় না, তার স্ত্রীর যে রকম স্বভাব। আবার কোন নতুন বিপদ না হয়! অন্য দিকে আবার এক রাত্রির জন্যে হলেও বিয়ের প্রথম দিকের দিনগুলো ফিরে পাবার লোভও হচ্ছিল তার। কে জানে, হয়ত অনেক দিন আলাদা থাকার পর সত্যিই স্ত্রীর মতিগতির পরিবর্তন হয়েছে। কিছুই ঠিক করে উঠতে পারল না হাউসডেন।

এদিকে স্বামীর কাছ থেকে কয়েক দিনের মধ্যেও কোন সাড়া না পেয়ে লীনা একদিন এসে তার সঙ্গে দেখা করল। এবার নারীসুলভ কৌশলে সে সহজেই হাউসডেনকে বশ করে ফেলল। হাউসডেনও রাজি হল যে ১৮ই ডিসেম্বর রাত্রে লীনার ফ্ল্যাটে যাবে।

যথা সময়ে হাউসডেন এসে হাজির হল তাদের হাইল্যাণ্ডপার্কের সেই পুরনো বাড়িতে। লীনা অপরূপ সাজে সেজে ছিল আগে থেকেই। দুহাত বাড়িয়ে সে সাদর অভ্যর্থনা জানাল হাউসডেনকে। রাত্রে প্রচুর খাবার ও মদের ব্যবস্থা দেখে পুলকিত হল হাউসডেন।

সে রাতের প্রথম ভাগে লীনা হাউসডেনের কাছে আবির্ভূত হল এক নতুন লাস্যময়ী পতিগতপ্রাণা স্ত্রী রূপে। স্বামীকে সকল প্রকার সুখ ও সম্ভোগ দান করতে কোন কার্পণ্যই করল না লীনা। তার সুন্দর মন প্রাণ দিয়ে পরিপূর্ণ করে ভরে দিল হাউসডেনের সকল কামনা-বাসনা। লীনা হাউসডেনের কোলে বসে নিজে গ্লাস গ্লাস মদ ঢেলে তাকে আকণ্ঠ পান করাল। মাত্রাতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই হাউসডেন অজ্ঞানের মত নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়ল শুভ্র কোমল বিছানায়। গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল সে।

Mamun Academy

এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিল লীনা। সে নিজে কিন্তু একটুও মদ ছোঁয়নি। হাউসডেন নাক ডাকাতে শুরু করলে পরে লীনা কয়েকবার চিমটি কেটে ও ডাকাডাকি করে দেখল যে ওদিক থেকে কোন সাড়াই নেই। হাউসডেন মদের নেশায় তখন জ্ঞানশূন্য। অতি পরিচিত সেই নির্বাক মুখের দিকে চেয়ে প্রথমে লীনার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হল, কিন্তু পরক্ষণেই সে মন শক্ত করে নিল; না সে বিপথগামী স্বামীকে মার্জনা করবে না। তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ সে আজ নেবে! এই ত সুযোগ!

ড্রয়ার খুলে লীনা বের করল একটি শক্ত সিল্কের রশি। সেই রশিতে ফাঁস তৈরি করে অজ্ঞান হাউসডেনের মাথা উঁচু করে তার গলায় পরিয়ে দিল সে ফাঁস। তারপর সব শক্তি দিয়ে জোরে কষতে লাগল ফাঁস। গোঁ-গোঁ শব্দ করে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল হাউসডেন। কিন্তু বাধা দেবার শক্তি ও সুযোগ সে পেল না। তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল, আর লীনাও প্রাণপণে কষতে লাগল তার গলায় ফাঁসের রজ্জু। এক সময় হাউসডেন ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। নাকের কাছে হাত নিয়ে ও নাড়ী টিপে লীনা দেখল কোন প্রাণের স্পন্দনই নেই হাউসডেনের দেহে। বুঝল, এবার সে সত্যিই মারা গেছে।

ওই শীতেও ঘেমে উঠল লীনা। উঠে দাঁড়িয়ে সে নিজ কপালের ঘাম মুছে নিল। খুব পরিশ্রান্ত সে, এত নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ একটি কাজ এত সহজে সমাধান করে সে এখন বিশ্রাম চায়। ভয়ানক ঘুমও পেল, আর দাঁড়াতে না পেরে মৃত স্বামীর পাশেই শুয়ে পড়ল সে।

যখন ঘুম ভাঙল লীনার, তখন ভোর হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ সেরে নিল সে। তখনও বিছানায় পড়ে আছে হাউসডেনের লাশ। এখন এটা সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

Mamun Academy

সে ঘরের মেঝেতে বিছানো কার্পেটটি গুটিয়ে একপাশে সরিয়ে রেখে সমস্ত মেঝেতে খবরের কাগজ বিছাল। তারপর লাশটি বিছানা থেকে মেঝেতে নামাল। আগে থেকেই সংগ্রহ করা ছিল বড় ছুরি, করাত ইত্যাদি, সেগুলো বের করে এবার সে একে একে মৃত দেহের হাত, পা, মাথা ইত্যাদি কেটে আলাদা আলাদা টুকরো করে ফেলতে লাগল। মানুষের একটি গোটা মৃতদেহ এভাবে একলা টুকরো করাটা বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। কিন্তু ধৈর্য ধরে সে সেই কাজ করে যেতে লাগল। সারাদিন কেটে গেল তার এতে। এর ফাঁকে সে দুবার বিশ্রাম করে খাবার খেয়ে নিল।

এবার সে মৃতদেহের টুকরোগুলো সযত্নে লাল ক্রিস্টমাস কাগজে জড়িয়ে নীল সিল্কের ফিতা দিয়ে বেঁধে অনেকগুলো আলাদা আলাদা সুন্দর প্যাকেট করে ফেলল। তারপর মেঝের রক্তমাখা কাগজ ও মৃতের জামা কাপড় সব জড়ো করে স্টোভ জ্বালিয়ে তাতে পুড়িয়ে ফেলল। এবার মেঝে ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার কার্পেট বিছিয়ে রাখল।

রাত্রে সে সেই প্যাকেটগুলো তার ফোর্ড গাড়ির পেছনের সীটে গুছিয়ে রাখল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন কতগুলো ক্রিস্টমাস উপহারের প্যাকেট অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্যে সযত্নে গুছিয়ে রাখা হয়েছে গাড়িতে। নীনা এবার ঠিক করল, গাড়ি চালিয়ে প্যাকেটগুলো নিয়ে সোজা চলে যাবে দূরে তার গ্রামের বাড়িতে। সেখানে কোন নির্জন বন অঞ্চলে প্যাকেটগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

প্রায় বাড়ির কাছে এসেও গিয়েছিল সে। এমন সময় হঠাৎ দেখা দিল তার নতুন গাড়িতে গোলমাল। যার জের হিসেবে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল।

পুলিশের কাছে সে অকপটে সব অপরাধই স্বীকার করল। স্বামী

তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাই তাকে শাস্তি দেবার জন্যেই সে এই চরম পন্থা অবলম্বন করেছে। নাহলে তার স্বামী সত্যিই খারাপ লোক ছিল না—যদিও খারাপ মেয়েলোক ও বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সে বিপথগামী হয়েছিল।

পুলিশ লীনাকে তখনই গ্রেপ্তার করল। তাদের হাইল্যাণ্ড পার্কের বাসা থেকে পুলিশ লীনার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী খুনের সব হাতিয়ার ও অন্যান্য আলামতের সন্ধান পেল।

Mamun Academy

অতঃপর মিশিগানের প্লেমাউথের আদালতে স্বামীকে খুন করার অভিযোগে লীনার বিচার শুরু হল। বিচারের সময়ে লীনার কৌশুলী কোর্টকে বলেন যে লীনা একজন উন্মাদ মেয়ে; কারণ সজ্ঞানে কোন স্ত্রীই এরকম কারণে ও এরকম পরিবেশে নিজ স্বামীকে খুন করতে পারে না। আদালত তখন লীনাকে ডাক্তারী পরীক্ষার আদেশ দেয়। পরীক্ষায় কিন্তু তাকে মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা করা হল।

বিচারে খুনের অপরাধে লীনাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দেয়া হয়।

মরণ-ফাঁদ

বহু বছর আগেকার কথা। আমেরিকার প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে একদিন এই বিজ্ঞাপনটি বেরুল :

বিবাহ বন্ধনে আগ্রহী। সম্পদশালী সুন্দরী এক তরুণী বিধবা একজন ধনী রুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী, উদ্দেশ্য জীবন সঙ্গিনী হওয়া। মহিলা একটি বড় ফার্মেরও অধিকারিণী। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

বেল্লা সেরেনসেন,
লা পো, ইণ্ডিয়ানা।

বিজ্ঞাপনটি বেরুবার পর অনেকগুলো প্রস্তাব এল বেল্লার কাছে। সেগুলোর মধ্যে প্রথমে একটি আবেদন বাছাই করে বেল্লা তাকে এই চিঠি পাঠাল।

'প্রিয়,

তোমার চিঠি পড়ে বুঝলাম যে তুমিই হলে আমার আকাঙ্খিত ব্যক্তি। আমি আশা করি তুমি আমার ও আমার প্রিয় বাচ্চাদের জীবন আনন্দে ভরে তুলবে। আর এই পৃথিবীতে আমার সব ধন সম্পদ, আমার দেহ, মন যা কিছু দেবার আছে সবই আমি নিশ্চিন্তে তোমার হাতে তুলে দিতে পারব। আমার একমাত্র আশা, আমি এমন একজন বিশ্বাসী জীবন-সঙ্গী চাই যাকে আমার সব কিছু দিয়ে

বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু যেহেতু এখনও আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি, তাই আমি ঠিক করেছি যে, আমার পানি-গ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে বিয়ের আগে সদিচ্ছার চিহ্ন স্বরূপ তার কিছু নগদ অর্থ বা সম্পদ আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে হবে। কারণ, আমার মতে, কেবল মাত্র এভাবেই আমি পরগাছা ও স্বার্থপর লোক-দেরকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারি। না হলে ওইসব লোক শুধু আমাকে ভোগ করার ও আমার সম্পদ হরণ করার উদ্দেশ্যেই আসবে। কম করেও আমার বিশ হাজার ডলারের সম্পত্তি আছে। তবে তুমি যদি তোমার সদিচ্ছার প্রমাণ স্বরূপ মাত্র পাঁচশ ডলার নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আস তবেই আমরা দুজনে একত্রে বসে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করে নেবার ও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাব।

আশা করি তুমি সাড়া দেবে।'

বেল্লা যাকে এই পত্রটি দিল সে ছিল একজন নিঃসঙ্গ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি। দেশ-বিদেশে প্রায়ই তাকে ভ্রমণে কাটাতে হত। আর এই পৃথিবীতে নিকট আত্মীয়-স্বজন বলতে তার বিশেষ কেউ ছিল না।

বেল্লার চিঠি পেয়ে সে ভয়ানক উৎসাহিত হল। যথা সময়ে নগদ পাঁচশ ডলার পকেটে নিয়ে ফিটফাট হয়ে সেজে গুজে এক সন্ধ্যায় সে বেল্লার 'লা পোর্টের' নির্জন বাড়ির দরজার কড়া নাড়ল। বেল্লা অপরূপ সাজে সেজে সেদিন ভেতর থেকে অভ্যর্থনা জানাল তাকে।

কিন্তু ভদ্রলোককে কেউ আর সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। সেই থেকে তার আর কোন খোঁজ খবরও পাওয়া গেল না। তবে ভবঘুরে মানুষ ছিল সে. তাই বিষয়টা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায়নি।

ঠিক একই ভাবে আরও কয়েকজন বেল্লার বিজ্ঞাপনে ও চিঠিতে আকৃষ্ট হয়ে নগদ পাঁচশত ডলার করে পকেটে নিয়ে তারিখ মত লা পোর্টে গিয়ে হাজির হয়েছিল। কিন্তু তাদেরও কাউকে আর সেখানে থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়নি কখনও। রহস্যজনক-ভাবে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

বেল্লার কিন্তু সাহিত্য প্রতিভা ছিল বলতে হবে। বিভিন্ন আবেদন পত্র দেখেই সে ঠিক ধরে ফেলত তার পানিপ্রার্থী লোকটি কি ধরনের; আর তাকে আকর্ষণ করতে কি ধরনের চিঠিই বা লিখতে হবে। এক-জন হতভাগ্য পানিপ্রার্থী যুবককে সে লিখল :

'তুমিই আমার রাজা। তোমার চিঠি পড়েই আমি ঠিক ধরতে পেরেছি যে তুমি একটি সত্যিকারের প্রেমিক হৃদয়ের অধিকারী। চলে এসো হে বন্ধু অচিরেই আমার কাছে। তোমার এই প্রেমিকা অধীর আগ্রহে তোমারই অপেক্ষায় বসে আছে।

আমার বাড়িটি হল উত্তর ইণ্ডিয়ানার সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি। এখানে এসে তুমি সত্যিই খুশি হবে। আর তখন আমরা রাজা-রাণীর মত আনন্দে বাস করব এখানে। তবে হ্যাঁ, তোমার যে আমার প্রতি সত্যিই আগ্রহ আছে তার প্রমাণ স্বরূপ নগদ পাঁচশ ডলার সঙ্গে আনতে কিন্তু ভুল না প্রিয়⋯।'

প্রতি ক্ষেত্রেই ওর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভদ্রলোকেরা এসে হাজির হত বেল্লার সেই নির্জন বাড়িতে। প্রত্যেকেই সদিচ্ছার প্রমাণ স্বরূপ সঙ্গে আনত কথিত নগদ পাঁচশ ডলার। এসব ক্ষণিকের অতিথিদের আদর আপ্যায়নেরও পরাকাষ্ঠা দেখাত বেল্লা। তারপর একসময় তারা ওর নরম বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ত, আর সেটাই হত তাদের চিরনিদ্রা।

অবশেষে ১৯০৮ সালে এনড্রু হোল্ডগ্রেন নামক এক যুবকের ভাই এনড্রুর খোঁজে অস্থির হয়ে উঠল। পাঁচ মাস আগে এনড্রু বেল্লা-রাণীর চিঠিতে আকৃষ্ট হয়ে তার একমাত্র রাজা হওয়ার বিপুল আগ্রহে পকেটে নগদ ৫০০ ডলার নিয়ে তার বাড়ি লা পোর্টের দিকে রওনা হয়। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ মাসের মধ্যেও এনড্রু আর ফিরে আসেনি বা তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অগত্যা ওর ভাই বড় এনড্রু মিস বেল্লাকে এই ঘটনা জানিয়ে তার ভাই-এর খবর জানাবার জন্যে একটি চিঠি দিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই চিঠির উত্তর এল। বেল্লা লিখছে: 'আপনার ভাইকে খুঁজে পাবার জন্যে আমি অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করব। সেই জানুয়ারীর প্রথম দিকে আপনার ভাই যে উৎফুল্লচিত্তে আমার এই বাসা ত্যাগ করেছিল, সেই থেকে আমি আর তাকে দেখিনি। তাকে খুঁজে বের করার জন্যে আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত। অবশ্যই তাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিখোঁজ এনড্রুর খোঁজ পেতে লা পোর্ট থেকে বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কেবলমাত্র ওই বাগানের শেষ প্রান্তে গেলেই কাঠের পাঁজার নিচে পাওয়া যেত হতভাগ্য এনড্রুর মৃতদেহ। আর সেই সঙ্গেই পাওয়া যেত বেল্লার পাণিপ্রার্থী আরও কয়েকজন হতভাগ্যের দেহাবশেষ।

বড় এনড্রু তার ভাই এর খোঁজে সম্ভাব্য সকল স্থানেই যাওয়া সাব্যস্ত করল। বেল্লাকেই তার সন্দেহ হল বেশি। তার এক বন্ধু পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে সে বেল্লার অতীত ইতিহাস জেনে নিল। এই অফিসারই বেল্লার স্বামীর মৃত্যুর তদন্ত করেছিল।

নিজ দেশ নরওয়ে থেকে শিশু বেল্লা সেরেনসেন ১৮৮৬ সালে

চলে আসে আমেরিকায় তার বাপ-মার সঙ্গে। যৌবনে সে ম্যাক্স সেরেনসেনকে বিয়ে করে এবং অস্টিন শহরে এসে তারা বসবাস শুরু করে। এখানে বেল্লার একে একে তিনটি সন্তান হয়। বাচ্চাদের সে অত্যন্ত ভালবাসত। তাদের নিয়েই তার প্রায় সারাক্ষণ আনন্দে কাটত। তার নিজের ও আশেপাশের বাসার বাচ্চাদের কলরবে তার বাস। সর্বক্ষণ মুখর হয়ে থাকত।

এমন সময়ে হঠাৎ তার স্বামীর অকাল মৃত্যু হয় ও অল্প বয়সেই বেল্লা বিধবা হয়ে পড়ে। অতঃপর সে তার প্রিয় বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তার স্বামীর যা কিছু সম্পদ ছিল তাই দিয়ে শিকাগো শহরে কয়েকটি বাড়ি কিনে ফেলল। কিন্তু বাড়িওয়ালী হিসাবে বেশি দিন সুখ ভোগ তার কপালে ছিল না, হঠাৎ এক অগ্নিকাণ্ডে তার সবগুলি বাড়ি পুড়ে যায়।

বাড়িগুলো কিন্তু সে আগেই ইন্সিওর করে রেখেছিল। সেই ইন্সিওরেন্সের টাকা আদায় করে বেল্লা এরপর একটি বেকারী খুলে বসল। কিন্তু একদিন এই দোকানটিও আগুনে পুড়ে গেল। এটাও কিন্তু ইন্সিওর করা ছিল। এবারও বেল্লা টাকার দাবি করাতে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির সন্দেহ হয়। তবে সুনাম রক্ষার খাতিরে শেষ পর্যন্ত তারা বেল্লাকে টাকা দিয়ে দিল বটে তবে সেই সঙ্গে কোম্পানি ওকে জানিয়ে দিল যে এরপর তার আর কোন ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করবে না। অনেকের মতে বেল্লা ইচ্ছা করেই তার বাড়ি ও দোকানে আগুন লাগিয়েছিল শুধু টাকার লোভে।

তিন নাবালক সন্তান নিয়ে বেল্লা এবার ইণ্ডিয়ানায় চলে এল। এখানে জনবিরল 'লা পোর্ট' এলাকায় একটি ফাঁকা বাড়ি কিনে সে বসবাস শুরু করল।

এখানেই গানেশ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে সে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। এ বিয়ে তাদের সুখের হল না ; অল্প দিনের মধ্যেই রহস্যজনকভাবে গানেশের মৃত্যু হল। মাথায় একটি ধারাল কুড়ালের মারাত্মক আঘাতে তার মৃত্যু হয়।

খুনের দায়ে বেল্লাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল। সেখানে সুন্দরী বেল্লা অশ্রুসিক্ত চোখে জুরীদের বুঝাতে সক্ষম হল যে তাদের বাড়ির উপরের সেলফ-এ রাখা ছিল ওই ধারাল কুড়ালটি। তার স্বামী গানেশ যখন উপর থেকে কুড়ালটি নামাচ্ছিল, তখন হঠাৎ তার নিজের হাত থেকেই ফসকে গিয়ে কুড়ালটি তারই মাথায় পড়ে যায় এবং আঘাতের ফলে তার মাথায় মারাত্মক ক্ষত হয় এবং পরে তাতেই সে মারা যায়।

বেল্লার বক্তব্য শুনে জুরীদের মনে করুণার উদ্রেক হয় ও শেষ পর্যন্ত তাকে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দেয়া হয়। স্বামী গানেশের ছিল বেশ কিছু টাকার জীবন বীমা। বেল্লা কোম্পানির কাছ থেকে ওই সব টাকা উঠিয়ে নিল। যদিও এবার টাকা পেতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়।

বেল্লা দেখল যে ভবিষ্যতে তার পক্ষে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে আর কোনও টাকা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। অথচ টাকা তার প্রয়োজন। তাই এবার সে অন্য পথে টাকা আয়ের সুযোগ খুঁজতে লাগল।

টাকা আয়ের উপায় হিসাবে সে এক নূতন ফন্দি খুঁজে বের করল তারপরই আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে বের হল তার বিয়ের প্রস্তাব সম্বলিত ওই বিজ্ঞাপনগুলো।

বড় এনড্রু বেল্লার এক পুরনো কর্মচারীকে হাত করে তার কাছ

থেকেও পরবর্তী রহস্যের অনেকখানি জেনে নিল। তার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে পানিপ্রার্থী যুবকেরা ওর নির্জন বাড়িতে এসে বেল্লার আদর আপ্যায়নে মোহিত হয়ে সুন্দরীর কোমল কোলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়ত। সেই সুযোগে বেল্লা যে কুড়ালের দ্বারা তার দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু ঘটিয়েছিল, সেই কুড়ালের ঘায়েই তার ওই সব নতুন প্রেমিকদের সাবাড় করত। তারপর ওদের পকেট হাতড়ে সব টাকা পয়সা বের করে নিয়ে তার আঙিনার বিরাট কাঠের স্তূপের নিচে ওই সব লাশ গোপনে পুঁতে রাখত।

এই ইতিহাস জানবার পরে বড় এনড্রু ছুটে এল বেল্লার বাড়িতে তার ভাই-এর খোঁজে। হঠাৎ তাকে ওভাবে দেখে বেল্লা আশ্চর্য হয়ে গেল। সে ভাবতেও পারেনি যে এনড্রু তার চিঠি পাবার পর এত শিগগির তার কাছে চলে আসবে। সে এনড্রুকে পরদিন আসতে বলল। এবার এনড্রু ছুটে গেল পুলিশের কাছে।

পুলিশ নিয়ে পরদিন ভোরে এনড্রু যখন 'লা পোর্টে' বেল্লার বাড়িতে এসে হাজির হল। তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। ছোট এনড্রুর হত্যাকারী বেল্লাকে জ্যান্ত ধরার, এমনকি তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগও বড় এনড্রু আর কোনদিন পেল না।

রহস্যজনকভাবে সেই রাত্রেই বেল্লার বাড়িতে এক মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। গভীর রাত্রের সেই অগ্নিকাণ্ডে বেল্লার সেই কাঠের বাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সেই অগ্নিদগ্ধ বাড়ির ভেতরেই পাওয়া গেল বেল্লার ও তার প্রিয় তিন সন্তানের মৃতদেহ, জড়াজড়ি অবস্থায় চারটি মৃতদেহই পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে শেষ পর্যন্তও প্রিয় বাচ্চাদের বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টায় বেল্লা তাদের সবাইকে কোলের ভেতর নিয়ে পিঠ দিয়ে সর্ব-

প্রাসী আগুন ঠেকাবার বৃথা চেষ্টা করেছিল।

সেই দিন থেকেই উধাও হয় বেল্লার বহুদিনের পুরনো কর্মচারী রয় লেম্পার। অনেকে ধারণা করল যে সে-ও বেল্লার ওই সব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল আর সে সবকিছুই জানত। মনে হল তাদের সব কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাবার বিপদ টের পেয়ে ওই রয়ই শেষ পর্যন্ত গভীর রাত্রে বেল্লার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে সব কিছু ধ্বংস করে দিয়ে পালায়।

এরপরও কিন্তু এনড্রু তার ভাই এর খোঁজ ত্যাগ করল না। তার নিশ্চিত ধারণা হল যে তার ভাই-এর খোঁজ লা পোর্টের আশে-পাশেই পাওয়া যাবে।

তার আগ্রহে বাড়ির ভগ্নাবশেষের ছাই স্তূপের ভেতরে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। প্রথমেই পাওয়া গেল সেই ধারাল কুড়ালটি। বাড়ির আঙিনায় বিরাট কাঠের স্তূপের নিচ থেকে পাওয়া গেল শুধু এনড্রুর দেহাবশেষই নয় সেই সঙ্গে আরও সাতাশটি হতভাগা মানুষের কঙ্কাল। প্রতিটি মৃতদেহেরই মাথার খুলি ধারাল কুড়ালের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করা।

নিষ্ঠুর বেল্লাই যে এই সবগুলো হত্যাকাণ্ডের হোতা সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই রইল না। যদিও তার এই জঘন্য সব হত্যাকাণ্ড বাইরের লোকে জানবার আগেই সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে তারই সখের বাড়িতে আগুনে পুড়ে সন্তানসহ ধ্বংস হয়ে গেল। মানুষের আদালতের কাঠগড়ায় তাকে আর দাঁড়াতে হল না বটে তবে তার বিচার অন্তর্যামীই করেছেন।

সহজ অর্থলাভের আশায়ই যে বেল্লা নির্বিচারে ওই সব পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চ-

র্যের বিষয় এই যে, দেখা গেল, বেল্লা অপব্যয়ী ছিল না। তার মৃত্যুর মাত্র অল্প কিছু দিন আগে উইল মারফত তার কুঅর্জিত বিপুল সম্পত্তির অধিকাংশই সে শিকাগোর এক এতিমখানায় দান করে গিয়েছিল।

Mamun Academy

রক্ষকই ভক্ষক

Mamun Academy

এই অভিনব ঘটনাটি ঘটেছিল কলকাতা শহরের বুকে ১৯৫৪ সালে। পিতৃহীন মেয়ে সুধারাণী রায়। পূর্ববঙ্গের এক শহরে ছিল তাদের বাস। ১৯৫০ সালের হিড়িকে সাত পুরুষের বাস্তুভিটা ছেড়ে সে তার মায়ের সঙ্গে চলে যায় বিশাল কলকাতা নগরীতে। তখন সুধারাণীর বয়স ছিল মাত্র ন-দশ বৎসর।

মায়ের সঙ্গে কিছুদিন সে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াল, কিন্তু কোন নিরাপদ আশ্রয়ই মিলল না তাদের। কিছুদিনের জন্যে তারা কলকাতার উপকণ্ঠে এক রিফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে তার মা তাকে ফেলে একদিন কোথায় উধাও হয়ে যায়। সুধারাণীর শত কান্নাতেও মা আর ফিরে এল না তার কাছে।

সুধারাণীর বয়স অল্প হলেও দেখতে সে বেশ সুশ্রী ছিল। এমন বাপ-মা হারা এই নাবালিকা মেয়েটিকে কে দেবে নিরাপদ আশ্রয় এই বিশাল নগরীতে?

শেষ পর্যন্ত এক সমাজ সেবকের চেষ্টায় বেশ ভাল আশ্রয়ই মিলল সুধারাণীর। কলকাতার 'নারী কল্যাণ আশ্রম' নামক একটি সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে সুধারাণী জায়গা পেল।

এখানে এসে সে প্রথমে নিজেকে বেশ নিরাপদই মনে করল। এই আশ্রমে থাকত অনেক মেয়ে, যারা হয় পিতৃমাতৃহীনা বা সমাজ পরি-

ত্যক্তা না হয় ত বাল্যবিধবা যাদের অন্য কোথাও কোন নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা ছিল না।

পূর্ব বাংলা থেকে আগত আশ্রয়হীনা আরও কিছু মেয়েও এখানে থাকত। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল এই সব নিরাশ্রয় মেয়েদের স্কুলে পড়িয়ে বা বিভিন্ন কুটির শিল্প শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যতে এদেরকে আত্মনির্ভরশীল ও সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

তখন এই নারীকল্যাণ আশ্রমের অবৈতনিক সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করত সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী নামক এক ভদ্রলোক। শোনা যেত যে এই আশ্রমের উন্নতির জন্যে সে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করত। এভাবে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্যে বাইরেও তার খুব নাম-ডাক ছিল। ভদ্রলোক সারাদিন তার নিজস্ব ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকত আর প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় আসত এই নারীকল্যাণ আশ্রমে।

এখানে ছিল সেক্রেটারীর একটি নিজস্ব কক্ষ। কাজের চাপে নাকি রাত বারটা একটা পর্যন্তও এখানে কাটাতে হত মিঃ গাঙ্গুলীকে। তাই তার বিশ্রামের জন্যে এখানে তার রুমে পাতা ছিল একটি খাট ও বিছানা। এ ছাড়া তার ঘরে একটি স্টীলের আলমারিও ছিল। সেটার মধ্যে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকত। শোনা যেত যে, আশ্রমের প্রতিটি মেয়ের প্রতি সে কড়া নজর রাখত। মেয়েদের চরিত্র গঠন ও শৃঙ্খলাবোধ সম্বন্ধে সে প্রায়ই তাদের উপদেশ দিত।

মাঝে মাঝে অবশ্য আশ্রমের দু-তিনটি যুবতী মেয়েকে সে তার নিজের কামরায় ডাকত তার প্রয়োজনীয় কিছু কাজ করে দেবার জন্যে। আবার যখন সে কাজের চাপে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত তখন সময় সময় ওই-মেয়েদের দিয়েই তার শরীরও ম্যাসেজ করিয়ে

Mamun Academy

নিত।

আশ্রমের জন্যে সাহায্য আদায় করতে সে সরকার, ধনী ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রায়ই উত্যক্ত করত। বাইরে থেকে সবাই জানত যে মিঃ গাঙ্গুলীই হচ্ছে নারীকল্যাণ আশ্রমের একমাত্র নিঃস্বার্থ কর্মী ও বলতে গেলে এর প্রাণ। অবশ্য তরুণ কুমার সরকার নামক এক-জন অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারীও ছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক মিঃ গাঙ্গুলী ও তার সহকারীর মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। মিঃ গাঙ্গুলী পছন্দ করত না যে তরুণ কুমার আশ্রমে বেশি যাতায়াত করে, বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে এখানে আসা তার এক প্রকার বারণই ছিল।

আশ্রমের মেয়েদের প্রতি সেক্রেটারীর এত কড়া নজর রাখা সত্ত্বেও ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে হঠাৎ সেখানকার কয়েকটি মেয়ে গোপনে আশ্রম থেকে পালিয়ে গেল। মিঃ গাঙ্গুলী ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করল।

কিন্তু কোন সূত্র থেকে ঘটনাটি থানায় রিপোর্ট করা হল। আর এ বিষয়ে তদন্ত করতে ২৯শে এপ্রিল রাত দশটার সময়ে মানিকতলা থানার অফিসার ইন-চার্জ তাঁর সাব-ইনসপেক্টর নির্মলচন্দ্র করকে নিয়ে হঠাৎ আশ্রমে এসে হাজির হলেন।

তদন্তের সময় সুধারাণী দারোগাকে গোপনে বলল, 'ওরা পালিয়ে গেছে না ত বেঁচে গেছে। উপায় থাকলে আমিও পালাতাম। এই নরকে কি কোন ভদ্র মেয়ের পক্ষে মান সম্মান বা চরিত্র বজায় রেখে থাকার উপায় আছে? অথচ আমাদের এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করার অধি-কার নেই। তাহলে আমাদের হয় রাতারাতি গায়েব করা হবে না হয় পথে নামতে হবে।'

দারোগা বাবু ছিলেন সত্যই ভাল লোক। তাঁর কাছে সুধারাণীর

Mamun Academy

কথাগুলো প্রথমে হেঁয়ালি বলে মনে হলেও এই অভিজ্ঞ পুলিশ কর্ম-চারী এতে পেলেন কোন গভীর অপরাধের গন্ধ। সুধারাণীকে নির্জনে ডেকে নিয়ে তার অভিযোগ সম্বন্ধে আরও প্রশ্ন করে তিনি জানতে পারলেন যে মেয়েদের নালিশ তাদের আশ্রমের সেক্রেটারী সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধেই।

দারোগার অভয়বাণী পেয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সুধারাণী সব কথা খুলে বলল তাঁকে। দৃঢ়তার সাথে সে জানাল, 'আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি বরং এই আশ্রমেরই মেয়ে নর্ময়া ও কল্যাণীকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তারাও এই লম্পট সেক্রেটারীর কামের ইন্ধন যুগিয়েছে আর আমারই মত তার কাছেই বিসর্জন দিয়েছে নারীর সবচেয়ে বড় সম্পদ—সতীত্ব।

'কিন্তু কার কাছে আমরা জানাব নালিশ? চাইব বিচার? আমরা সব যে নিরাশ্রয়া হিন্দু মেয়ে! সমাজেও আমাদের স্থান নেই। আবার এই নরক থেকেও বেরুবার উপায় নেই। আজ যখন আপনাকে পেয়েছি আর আপনি অভয় দিয়েছেন, তখন সব কথা আপনাকে খুলে বলব, দেখি এতবড় অত্যাচারের বিচার হয় কিনা।' চোখের জল মুছতে মুছতে এতগুলো কথা বলে গেল সুধারাণী।

দারোগা বাবু এর পরে নর্ময়াকে ডেকে পাঠালেন। দারোগার প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে সে ইতস্ততঃ করলেও অভয় পেয়ে পরে সব গোপন কথা অকপটে খুলে বলল।

এর পরে আনা হল কল্যাণীকে। এ মেয়েটি রূপযৌবনে পরিপূর্ণা থাকলেও সে ছিল বোবা ও বুদ্ধিহীনা। বাপ-মা এই মেয়েকে সৎ পাত্রে প্রদানের কোন উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত এখানেই রেখে যায়। এই বোবা মেয়ে কল্যাণীও হাব-ভাব ও ইশারায় দারোগাকে বুঝিয়ে

Mamun Academy

দিল কিভাবে সেও কয়েকবার সেক্রেটারীর কামের নিকট নিজের সতীত্ব বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে।

মাত্র কয়েকদিন আগে, অর্থাৎ ২০শে এপ্রিল রাত্রে সেক্রেটারীর কামরায় যে পাপের স্রোত বয়ে গেছে অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে সে কাহিনীও সংগ্রহ করলেন দারোগা বাবু এই মেয়েদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে :

'অন্যান্য দিনের মত সেদিন অর্থাৎ ২০শে এপ্রিল (১৯৭৪ সাল) সন্ধ্যার পরে সেক্রেটারী সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী এল নারীকল্যাণ আশ্রমে। প্রথমে ঘুরে ঘুরে আশ্রমটি দেখল যে, দু'একজন মেয়ের সঙ্গে কথাও বলল। তারপর এসে বসল তার নিজের নির্দিষ্ট কামরায়। সেখানে বসে কাজ করতে করতে বেশ রাত হয়ে গেল। আশ্রমের অনেকেই খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছে ততক্ষণে।

এমন সময় সুধারাণী ও নর্মদার ডাক পড়ল স্বয়ং সেক্রেটারীর কামরায়। তারা আসতেই গাঙ্গুলী চেয়ার থেকে উঠে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। মেয়ে দুটিকে বলল যে সারাদিন কাজ করে সে খুব পরিশ্রান্ত, তাই দুজনে যেন ভাল ভাবে তার শরীর ম্যাসেজ করে দেয়। মেয়ে দুটি অগত্যা লেগে গেল সেক্রেটারী গাঙ্গুলীর গা ম্যাসেজ করতে। কিছুক্ষণ পরে মিঃ গাঙ্গুলী উঠে এল তার বিছানা ছেড়ে। মেয়ে দুটিকে দেরি করতে বলে সে চাবি দিয়ে তার স্টীলের আলমারি খুলে সেখান থেকে বের করল একটি চামড়ার ব্যাগ। এই ব্যাগের মধ্যে ছিল জন্মনিয়ন্ত্রণের 'ক্যাপ'। কয়েকটি ক্যাপ বের করে নিল গাঙ্গুলী। তারপর সে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা জানালাগুলো সব ভেতর থেকে আটকে দিতে লাগল। সুধারাণী বলল, 'এখন আপনি বিশ্রাম করুন, আমরা যাই।' গাঙ্গুলী বাধা দিল তাতে,

Mamun Academy

বলল আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। গাঙ্গুলীর মুখের ভাবা ও হাবভাব দেখে মেয়ে দুটি প্রমাদ গুণল। কিন্তু উপায় নেই, গাঙ্গুলী যে এই আশ্রমের সর্বশক্তিমান সেক্রেটারী। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার সাহস এই সব অসহয়া মেয়েদের কারও নেই।

এবার নর্মদার হাত ধরে গাঙ্গুলী তাকে নিয়ে গেল তার বিছানার কাছে। দু'একটি আবেগপূর্ণ আলিঙ্গন ও চুম্বন দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অবাক বিস্ময়ে সুধারাণী দাঁড়িয়ে দেখল যে তার চোখের সামনেই গাঙ্গুলী নর্মদার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হল।

কাজ সেরে সেক্রেটারী একটু বিশ্রাম নিল। সংলগ্ন বাথরুম থেকে ঘুরে এসে ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ গরম চা ঢেলে নিয়ে আবার তার ব্যাগ খুলে বের করল একটি কালো পিল। চায়ের সঙ্গে গাঙ্গুলী সেই পিলটি খেয়ে নিল। সেটা ছিল যৌন উত্তেজক পিল।

এবার তার নজর পড়ল সুধারাণীর উপর। ভয়ে সুধারাণী ঘরের এককোণে পালাল। নর্মদা ততক্ষণে বিছানা থেকে উঠে এসে কাপড় ঠিকঠাক করে ঘরের একপাশে বসে পড়ল অনুশোচনায় দুহাতে মুখ ঢেকে।

সেক্রেটারী ডাকল সুধারাণীকে তার কাছে আসতে। কিন্তু সুধারাণী নড়ল না। একবার সে বাইরে পালাবার চেষ্টাও করল কিন্তু সেক্রেটারী মত্ত পশুর মত এক লাফে তাকে ধরে ফেলল। সুধারাণী শত অনিচ্ছা ও বাধা দেয়া সত্ত্বেও কিছুতেই মুক্তি পেল না সেই নর পশুর হাত থেকে। জোর করে বিছানায় টেনে নিয়ে নর্মদার চোখের সামনে সেদিন সুধারাণীরও সর্বনাশ করল গাঙ্গুলী জোর করে। এর পর দু'জনের হাতে দুটি আধুলী দিয়ে গাঙ্গুলী তাদেরকে বিশেষভাবে

সতর্ক করে দিল যেন তারা কেউ কোনমতেই এই কথা কারও কাছে ফাঁস না করে। আর যদি এ কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় তবে তাদের দুজনের কারোই রক্ষা থাকবে না।

চোখের জল মুছতে মুছতে তারা ফিরে এল নিজেদের কামরায় সে রাত্রের মত।

তদন্তে আরও জানা গেল যে ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায়ই সেক্রেটারী আশ্রমের অসহায়া মেয়েদের নিয়ে এই একই খেলায় মেতে উঠত।

ওদের কথামত দারোগা বাবু সেক্রেটারীর কামরায় গিয়ে হাজির হল। মেয়েদের নির্দেশ মত সেখানে রাখা সেক্রেটারীর আলমারি খুলতে চাইল। কিছুক্ষণ দারোগার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে গাঙ্গুলী শেষ পর্যন্ত আলমারি খুলতে বাধ্য হল। তার ভিতরেই ছিল একটি চামড়ার ব্যাগ। সেটা খুলতেই ভিতর থেকে বেরুল জন্মনিয়ন্ত্রণের 'ক্যাপ' ও আরও কয়েকটি ঔষধ। ওসব জিনিস এখানে রাখার কোন সদুত্তর দিতে পারল না সেক্রেটারী গাঙ্গুলী।

এমন সময় আশ্রমের ঝাড়ুদারণী এসে দারোগাকে জানাল যে ওরকম কতগুলো রাবারের জিনিস সে সেক্রেটারীর কথামত মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। দারোগার নির্দেশ মত সেক্রেটারীর কামরার কাছেই সাক্ষীদের সামনে ঝাড়ুদারণী মাটি খুঁড়ে বের করে আনল কয়েকটি ব্যবহৃত 'রাবার ক্যাপ'।

অফিসার ইন-চার্জ এ ব্যাপারে একটি কেস রেকর্ড করে নিজেই তার তদন্ত সম্পন্ন করলেন। শেষ পর্যন্ত সেক্রেটারী সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে আশ্রমের মেয়ে সুধারাণী ও নর্মদার উপর পাশবিক অত্যাচার করার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা (বলাৎ-

Mamun Academy

কার) অনুযায়ী তাকে দায়রায় সোপর্দ করা হল।

বিচারের সময়ে আসামী গাঙ্গুলী অবশ্য কোর্টে তার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করে। তার মতে আশ্রমের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী তরুণ কুমার ও তার দলীয় কয়েকটি মেয়ে পুলিশের সহযোগিতায় তার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মামলার অবতারণা করেছে।

আলীপুর সেশন কোর্টে জুরীদের সাহায্যে এই বিখ্যাত মামলার বিচার শুরু হয়। অন্যান্য সাক্ষীদের মধ্যে সাক্ষী সুধারাণী ও নর্মদাও কোর্টে শপথ নিয়ে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করল পরিপূর্ণ কোর্টে। বোবা মেয়ে কল্যাণীও কোর্টে এসে সাক্ষ্য দিল। সে হাবেভাবে ও ইশারায় পরিষ্কার ভাবে জানাল যে আসামী তাকেও অন্য সময় কামরায় ডেকে নিয়ে তারও উপর অনুরূপ পাশবিক অত্যাচার করেছে। কল্যাণীর সাক্ষ্যের সময় কলকাতা মূক ও বধির স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল কোর্টের আদেশে সেখানে হাজির হন এবং কোর্টকে কল্যাণীর সাক্ষ্য সঠিকভাবে বুঝতে সহায়তা করেন। কল্যাণী মূক ও বধির স্কুলেরই ছাত্রী ছিল।

সেই নারীকল্যাণ আশ্রমের ও স্কুলের রেজিস্টার খুলে দেখা গেল যে ঘটনার সময় সুধারাণীর বয়স ছিল মাত্র তের-চৌদ্দ বৎসর। আর নর্মদার বয়স ছিল ষোল বৎসরের মত। এখন কোর্টে উভয় পক্ষের মধ্যে বাধল এক আইনের কূট তর্ক। এক্ষেত্রে ঘটনার (পাশবিক অত্যাচারের) পরপরই মেয়েরা কোন নালিশ জানায়নি, তাই ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুযায়ী মেয়ের বয়স ষোল বৎসরের বেশি হলে ৩৭৬ ধারার (বলাৎকার) চার্জ আসামীর বিরুদ্ধে আইনতঃ টিকতে পারে না।

মেয়েদের ডাক্তারী পরীক্ষা করে প্রকাশ পেল যে সে সময় সুধা-

Mamun Academy

রাণীর বয়স ছিল তের-চৌদ্দ বৎসর। কিন্তু ডাক্তারের মতে নর্মদার বয়স তখন ষোল বৎসরও হতে পারে।

সবদিক বিবেচনা করে জুরীগণ কেবলমাত্র নাবালিকা সুধারাণীকে ধর্ষণের অভিযোগে আসামী সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলীকে দোষী বলে ঘোষণা করেন। নর্মদার বয়স ষোল বৎসরের উপরও হতে পারে, আর আসামী হয়ত তার সম্মতিতেই তার সঙ্গে যৌন কার্যে লিপ্ত হয়েছিল, এই সন্দেহের অবকাশে নর্মদার অভিযোগ থেকে আসামীকে মুক্তি দেয়া হল। মাননীয় সেশন জজ বাহাদুর জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আসামীকে এই কঠোর সাজা প্রদানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাননীয় জজ তাঁর রায়ে বলেন :

'এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আসামী আশ্রমের অসহায়া মেয়েদের অভিভাবক ও পিতৃ সম্পর্কের ব্যক্তি হয়েও তাদের উপর এই জঘন্য আচরণ করতে দ্বিধা বোধ করেনি। তাই আসামী একজন ভদ্রবেশী নরপশু ছাড়া আর কিছুই নয়। আসামীর এমন সাজা পাওয়া উচিত যা ভবিষ্যতে অন্যদের উদাহরণ স্বরূপ হয়ে থাকে।'

উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামী প্রথমে হাইকোর্টে ও পরে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টেও আপীল দায়ের করে। কিন্তু উভয় কোর্টই আপীল ডিসমিস করে দেয় ও সেশনের রায় বহাল রাখে।

Mamun Academy

কুসুমে কীট

সে বহুদিন আগের কথা।

১৮৯৬ সালের ২৪শে জুলাই কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত বাংলা পত্রিকা 'হিতবাদী'তে একটি চাঞ্চল্যকর কবিতা প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই কবিতাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বঙ্গ সমাজে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এবং শেষ পর্যন্ত সেই কবিতার জের কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়।

Mamun Academy

কবিতাটি ছিল এই:

রুচি বিকার

(১)

শুনিবনা শুনিবনা মধুপ ঝঙ্কার
কুসুমে কুরুচি মাখা
ভ্রমরে লুকিয়ে রাখা
ছি ছি লাজে মরে যাই ভাবিব না আর,
করিব না সাদা প্রাণে কুরুচি সঞ্চার ॥

(২)

কুসুমের কোমলতা মাধুরী অপার
কিন্তু তার পবিত্রতা—
শুধু কল্পনার কথা

জানি তাহে দুষ্ট অলি করিছে বিহার।
লুটেছে সঞ্চিত মধু—মধুর ভাণ্ডার॥

(৩)

শুধু কি এ কুসুমের অলি প্রেমাধার?
আজি গণপতি গলে
কালি বিষ্ণু পদতলে
দিনান্তরে দেবান্তরে অবস্থিতি তার।
এ কেমন রীতি নীতি এ কি ব্যবহার।

(৪)

পদে পদে প্রসূণের দেখি অনাচার।
আজি উপেন্দ্রের ভোগ্য
কালি হেরম্বের যোগ্য
দেখিলে রুচির দোষ না হয় কাহার?
আমি জানি ফুলদল নিতান্ত অসার।

(৫)

আমি সুরুচির দূত নব অবতার।
কলঙ্কের কথা কয়ে
সুরুচির মাথা খেয়ে
কেমনে পরিব গলে কুসুমের হার?
মাখিব কলঙ্ক কেন গায়ে আপনার?

(৬)

আঘ্রাত কুসুমে শুধু রুচির বিকার,
দেবতার পূজা তাহে
সুরুচি কভু না চাহে

Mamun Academy

কুসুম কলিকা যোগ্য নহেক পূজার
ফুল দিয়ে দেব পূজা ! বাকি বা কি আর ?

(৭)

আছে যত পৌত্তলিক বেড়িয়া সংসার,
তারাই কুসুম দামে
পূজা করে শালগ্রামে
পূজে ভাঁড়, পূজে গাছ, মূর্তি-মৃত্তিকার
এখনও হয় নাই বুদ্ধি সভ্যতার ।

(৮)

এক স্থলে কুসুমের আছে অধিকার,
উঠুক নারীর চুলে
পরাই খোঁপায় তুলে,
সে সময়ে থাকিব না সুরুচির ধার
তখন দেখিব শুধু খোঁপার বাহার ।

(৯)

সে সময় কিবা মূর্তি । দেবী কোন্ ছার,
ইচ্ছা করে মেলি আঁখি
চিরকাল চেয়ে থাকি,
রুচি শিক্ষা পবিত্রতা হোক একাকার,
সব দেই বিসর্জন সম্মুখে প্রিয়ার ।

(১০)

হায় । কুরুচির হাতে হলো না উদ্ধার ।
করিয়াছি মহাপাপ
অনুতাপ অনুতাপ !

Mamun Academy

শোভায় ভুলিয়া মোহ হয়েছে আমার।
হইয়াছি পৌত্তলিক দোষ কল্পনার।

(১১)

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্মরি নিরাকার।
শান্তি ওঁ তৎ সৎ
এই দেই নাকে খত
উঠিয়াছে উথলিয়া দুঃখ পারাবার।
ফুলের অলির কথা সমাপ্ত এবার।

উপরোক্ত কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝতে হলে তৎকালীন হিন্দু-বঙ্গ সমাজ সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। তখনও দেশে স্বরাজ আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি। তবে বাংলার হিন্দুদের দুটি দলের মধ্যে সমাজ সংস্কার নিয়ে প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল সেই যুগে। এদের একটি দল ছিল রক্ষণশীল অর্থাৎ প্রাচীন সনাতনী হিন্দু ধর্মের অনুসারী। অন্য দলটি ছিল প্রগতিশীল। তারা ছিল হিন্দু ধর্মের ও সমাজের আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী। পাশ্চাত্যের প্রভাব এদের উপর ছিল সুস্পষ্ট। এই প্রগতিশীলদেরই প্রচেষ্টায় তখন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ।

সনাতনী হিন্দু ধর্মের অনুগামীদের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন তৎকালীন 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক বাবু কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ। তিনি তাঁর পত্রিকা মারফত সনাতনী হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে ও সেই সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

অপরপক্ষে ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন বাবু হেরম্ব চন্দ্র মিত্র ও তাঁর সুন্দরী, আধুনিকা স্ত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী মিত্র। এহেন প্রগতিশীলা কুসুমকুমারীর রূপ যৌবন ও প্রবল আকর্ষণ

শক্তি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ বলেও সনাতনীরা মনে করত। কারণ ব্রাহ্ম সমাজের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন কুসুমকুমারী। ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ও অন্যান্যদের মতে কুসুমকুমারীই ছিল ওই কবিতায় আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল, অর্থাৎ তাঁর চরিত্র কলঙ্কিত করা ও লোক সমাজে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল কবিতাটির প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া কুসুমকুমারীর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধেও অবশ্য খুব সুনাম ছিল না। হেরম্বের বিবাহীতা স্ত্রী হয়েও তিনি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতেন। বিশেষ করে উপেন্দ্র নামক জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা অনেকেরই চক্ষুশূলের কারণ হয়েছিল।

লোকে বলত বিয়ের আগেই নাকি কুসুম ও উপেন্দ্রের মধ্যে প্রণয় ও অনুরাগ ছিল। হেরম্বের সঙ্গে কুসুমের বিয়ের পরেও সেই বিগত প্রেম অনেকের নিকট মুখরোচক আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে তৎকালীন হিন্দু সমাজে হিন্দু কুল বধূদের এহেন আধুনিকতা হিন্দু সমাজপতিদের পক্ষে ছিল অসহনীয়।

এই পটভূমিতে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশন বসে। উক্ত অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম সমাজের নেতা বাবু হেরম্ব মিত্র ও সনাতন হিন্দু সমাজের নেতা বাবু কালী প্রসন্ন কাব্য-বিশারদ কলকাতা থেকে একই জাহাজে মাদ্রাজ রওনা হন। সে জাহাজে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে। সে সময় উভয় নেতা ও তাঁদের পক্ষদ্বয় একমত হয় যে মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশনে কোন এক বিশেষ বিতর্কমূলক ব্যক্তিকে বক্তৃতা দেয়ার বিরুদ্ধে উভয়ে সমবেত ভাবে বাধা প্রদান করবে। এই সিদ্ধান্তের পর জাহাজে বসেই অন্যান্য

Mamun Academy

সদস্যদের সমর্থন চেয়ে এক আবেদনপত্রে তাঁরা উভয়েই সই করেন।

কিন্তু মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত সেই বিতর্কমূলক ব্যক্তির বক্তৃতা সময় তার প্রতিবাদে হেরম্ব বাবু তার দলবল সহ অধিবেশন থেকে বেরিয়ে এলেও, কালীপ্রসন্ন বাবু কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে তাঁর দল সহ অধিবেশনে থেকে যান। এই ব্যাপারে হেরম্বরা কালীপ্রসন্নের দলকে টিটকারি দিতে থাকে।

কলকাতায় ফিরে এসে বিষয়টি নিয়ে সনাতনীদের হিতবাদী পত্রিকায় কয়েকটি লেখাও প্রকাশিত হয়। সেগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হেরম্ব বাবু ও তাঁদের ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান, অপর পক্ষও কিন্তু চুপ করে বসে ছিল না। তাঁরাও তাদের সঞ্জীবনী পত্রিকায় এবং বিভিন্ন মিটিং এ হিন্দু সনাতনীদের বিরুদ্ধে সমানভাবে প্রচারণা চালাচ্ছিল। আর এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সুন্দরী কুসুমকুমারী।

ঠিক এমনি সময়ে হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'রুচি বিকার' নামক ওই কবিতাটি।

এই কবিতা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বারুদের স্তূপের উপর বোমা বিস্ফোরণ ঘটল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে কবিতাটি হেরম্ব বাবু ও তাঁর আধুনিকা স্ত্রী কুসুমকুমারীকে উদ্দেশ্য করেই লেখা, আর সেই সঙ্গে এদ্বারা গোটা ব্রাহ্ম সমাজকেও লোক চোক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবার সমাজ ও রাজনীতি ছেড়ে একেবারে গৃহের অভ্যন্তরে পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ! স্বভাবতঃই হেরম্ব বাবুর পক্ষের লোকেরা এতে ভয়ানকভাবে ক্ষেপে উঠল।

এই কবিতার বিষয় নিয়ে টিপ্পনি কেটে, এর জের টেনে কলকাতার আরও দুটি কাগজে কয়েকটি কড়া মন্তব্য ছাপা হল, আবার 'কুসুমে কীট' নাম দিয়ে আরেকটি সমালোচনা ছাপা হল ওই কবিতাটিকে সময় উপ-

যোগী বলে বাহবা দিয়ে। আর সবার মুখে মুখে ত এ নিয়ে আলোচনা লেগেই রইল।

বেচারি কুসুমকুমারীর পক্ষে এর পরে আর লোক সমাজে বের হবার পথ রইল না।

হেরম্ব বাবু কিন্তু ব্যাপারটি নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করে চেপে যেতে চাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই এই অপমান নীরবে সহ্য করতে রাজি হল না। হেরম্ব বাবু তাদের বুঝালেন যে ক্রমে ক্রমে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে অযথা কবিতাটি জিইয়ে রাখা হবে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী কর্মীরা নাছোড়বান্দা। তারা বুঝাল যে এই অপমান নীরবে হজম করলে সনাতনীদের সাহস ক্রমান্বয়ে বেড়েই যাবে। আর তা হবে ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

শেষ পর্যন্ত হেরম্ব রাজি হলেন। প্রথমে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে কালীপ্রসন্নের উপর উকিলের নোটিশ দেয়া হল, অন্যথায় তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হবে বলে হুমকি দেখান হল। কিন্তু অপর পক্ষ থেকে কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। কাগজে একটু দুঃখ পর্যন্ত প্রকাশ করল না তারা।

শেষ পর্যন্ত হেরম্ব মিত্র কলকাতা হাইকোর্টে কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনলেন। আর্জিতে বলা হল যে ওই কবিতা দ্বারা আসামী কালীপ্রসন্ন বাদী হেরম্ব মিত্র ও তাঁর স্ত্রী কুসুমকুমারীর ভয়ানক মানহানি করেছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ও ৫০১ ধারা অনুযায়ী হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করা হল, কারণ ওই কবিতায় কোন লেখকের নাম ছিল না।

সেকালে এই সব মামলা সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টে রুজু করা হত ও জুরীর সাহায্যে সেখানে বিচার হত।

তৎকালীন হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ জেঙ্কিন্স জুরী-দের সহায়তায় এই মামলার বিচার করেন। ১৮৯৭ সালের ২৭শে জানুয়ারী তিনি এই বিখ্যাত মামলার রায় প্রদান করেন।

বিচারক ইংরেজ, অথচ কবিতাটি ছিল বাংলা ভাষায়। তাই বিচারকের অবহিতির জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ কবিতাটি সাবধানে ইংরেজীতে অনুবাদ করানো হয়। তা ছাড়া কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার জন্যে বাংলা ভাষার তৎকালীন প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের আহ্বান করা হয় হাইকোর্টে সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্যে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়, নবীন চন্দ্র সেন, গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী, কালিদাসচন্দ্র বিদ্যা-ভূষণ, হেমচন্দ্র রায়, হর প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অটলবিহারী ঘোষ, ঋষি-কেশ শাস্ত্রী, ভূপেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের দিকপালগণ।

এগারটি অনুচ্ছেদের এইকবিতাটির জন্যে আসামী কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধে মোট ১৮টি চার্জ আনা হয়। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম অভি-যোগ ছিল যে বাদী হেরম্বের স্ত্রী কুসুমকুমারীকে আসামী দ্বারা ওই কবিতায় ব্যাভিচারিণী চরিত্রহীনা ও পরকীয়ার মিথ্যা অভিযোগে চিত্রিত করে তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে লোক সমাজে হেয় ও নিন্দ্যনীয় প্রতিপন্ন করার হীন চেষ্টা করা হয়েছে। কবিতায় কোন লেখকের নাম ছিল না, তাই এর প্রকাশক কালীপ্রসন্নই এটা লেখা ও প্রচা-রের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী এবং তাঁর বিরুদ্ধেই সমস্ত অভিযোগ আনা হয়।

এই মামলার বিচারের সময়েও হাইকোর্টে আসামী কালীপ্রসন্ন

Mamun Academy

কবিতাটির লেখকের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে আসামী নিজেই ওই কবিতা রচনা করেছেন এই অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেন।

বাদীপক্ষ থেকে বলা হয় যে ওই কবিতায় 'কুসুম' শব্দটি এক বচন অর্থে হেরম্বের স্ত্রী কুসুমকুমারীকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। 'বিহার' অর্থে বুঝিয়েছে 'পর পুরুষের সঙ্গ ব্যভিচারে লিপ্ত (কুসুমকুমারী) 'ভোগ্য' অর্থে বুঝায় পর পুরুষের ভোগের সামগ্রী। 'আঘ্রাত কুসুম' অর্থে বুঝিয়েছে চরিত্রহীনা ও পরকীয়া কুসুম-কুমারী। এর বিপরীত শব্দ 'অনাঘ্রাত' অর্থে বুঝায় পবিত্র ও সতী-সাধ্বী। পৌত্তলিক অর্থে বুঝিয়েছে ব্রাহ্মদের। 'অনুতাপ' 'ওঁম তৎ-সৎ' 'শান্তি ও নিরাকার' এসব শব্দও ব্রাহ্মদের উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে।

অপর দিকে আসামীপক্ষ এই বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে 'রুচি-বিকার' একটি সাধারণ কবিতা। বাদীপক্ষের অভিযোগ অস্বী-কার করে আসামীপক্ষ কোর্টকে জানায় যে কাউকে আক্রমণ করে বা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজকে লোক সম্মুখে হেয়প্রতিপন্ন করার কোন উদ্দেশ্যই এই কবিতায় কোন সময়ে ছিল না। কবিতার অন্ত-নিহিত উদ্দেশ্য ও অর্থ সম্বন্ধে বাদীপক্ষের যুক্তি ভিত্তিহীন। বরং সমস্ত কবিতাটি পাঠ করলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে এই কবিতায় অতি আধুনিকতাকেই নিন্দা করা হয়েছে, কোন বিশেষ মহিলা এমনকি ব্রহ্ম সমাজকেও নয়। আসামীপক্ষের মতে এই কবিতায় কুসুম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ফুলদল অর্থে। আর 'কুসুম' শব্দটি বহুবচনেই ব্যবহৃত হয়েছে।

কবিতায় উপেন্দ্র, গণপতি, হেরম্ব এসব নামগুলো বিভিন্ন হিন্দু

দেবতাদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয় বা তাদের লক্ষ্য করেও বলা হয়নি। 'আজ গণপতির তালে' কবিতার এই অংশে ফুলের মালার কথাই বলা হয়েছে কোন বিশেষ একটি ফুলের কথা বলা হয়নি। কবিতায় 'তার' অর্থে তাদের বুঝিয়েছে। ছন্দ ও তাল ঠিক রাখার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে বহুবচনের স্থানে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। মোটকথা আসামীপক্ষের মতে নির্বিকার মন নিয়ে সমস্ত কবিতাটি পাঠ করলে কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ বা আক্রোশ বুঝাবে না বরং একটি সুন্দর ও মধুর কবিতার ভাবই প্রকাশ পাবে এতে।

বিচারপতি মিঃ জেঙ্কিন্স উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে ও বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও ভাষাবিদগণের অভিজ্ঞ মতামত গ্রহণের পর জুরীদের প্রতি তাঁর আবেদনে বলেন:

'জুরী মহোদয়গণ, আপনারা সাক্ষ্য-প্রমাণ সব শুনেছেন। বাংলা ভাষা সম্বন্ধেও আপনারা সবাই অভিজ্ঞ। যদি আপনারা মনে করেন যে 'রুচি বিকার' নামক এই কবিতায় 'কুসুম' শব্দ একবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তবে বাদীপক্ষের অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়। সে ক্ষেত্রে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে। আর যদি আপনারা মনে করেন যে 'কুসুম' শব্দ এখানে বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, তবে আসামী পক্ষের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। তবে সেইসঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে 'কুসুম' শব্দের সঙ্গে বেছে বেছে হেরম্ব, উপেন্দ্র ইত্যাদি নাম যোগ করার উদ্দেশ্য কি? এগুলো কি সত্যিই বাদীপক্ষকে হেয় করার জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে? তা ছাড়া এই কবিতার প্রকৃত লেখক কে, তা প্রকাশ করা হয়নি কেন? যদিও এ সম্বন্ধে আদালত বার বার আসামীকে

Mamun Academy

বলেছে। তাই বাদীপক্ষের যুক্তি, যে আসামী কালীপ্রসন্ন নিজেই ঐ কবিতার লেখক, এ কথা জোরাল বলেই মনে হয়। না হলে যদি প্রকৃত লেখককে আমাদের সামনে হাজির করা হত, তবে এই বিতর্কমূলক কবিতার প্রকৃত অর্থ আমরা তাঁর কাছ থেকেও শুনতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আসামীপক্ষ কোর্টকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু কেন?

'আর এটাও মনে রাখতে হবে যে সাধারণ পাঠক, যারা এই কবিতা পাঠ করবে তাদের মনে এই কবিতা পড়ার পরে কি ভাবের উদয় হবে? স্বভাবতই এই সব পাঠকেরা সবাই কবিতার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও ভাবার্থ বুঝতে সক্ষম হবে না। এই কবিতা পড়া মাত্রই যদি সাধারণ পাঠকের মনে হয় যে এটা বাদীদের আক্রমণের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে, তবে আসামীকে অবশ্যই দোষী বলে ঘোষণা করতে হবে।'

জুরীগণ সবাই একমত হয়ে আসামী কালীপ্রসন্নকে দোষী বলে ঘোষণা করেন। জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে বিচারপতি আসামী কালীপ্রসন্নকে নয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

Mamun Academy

নাবালিকা স্ত্রীর হেফাজত

মোহাম্মদ লতিফ পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দা হলেও সে বহুদিন যাবৎ বাস করছিল মধ্যপ্রাচ্যের দুবাই রাজ্যে। সেখানে সে কাঠ-মিস্ত্রির কাজ করত।

সমুদ্রপথে দুবাই করাচী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। দুবাইয়ে ব্যবসা বেশ জমে উঠলে লতিফ সেখানে একটি বাসা করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তার পরিবার নিয়ে গিয়ে বসবাস শুরু করল।

লতিফের বাসার কাছেই বাস করত আকবর আলী নামক আর একজন পাকিস্তানী যুবক। সে কাজ করত দুবাইয়ের ব্রিটিশ মিলিটারী ক্যান্টনমেন্টে। বিদেশে পাকিস্তানী নাগরিক ও পড়শী হিসাবে আকবর আলী লতিফের বাসায় যাতায়াত করত ও তার পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিল।

নাজমা নামে লতিফের ছিল একটি মেয়ে। বয়স তখন তার অল্প, তবে দেখতে খুবই সুন্দরী ছিল। আকবর বাসায় এলেই সে দৌড়ে যেত তার কাছে। আকবরও তাকে আদর করে এটা ওটা কিনে দিত। নাজমাকে তার খুব ভাল লাগত। সময় পেলেই যেত তাদের বাসায়।

প্রথম দিকে নাজমার বাপ-মা এদিকে বিশেষ নজর দেয়নি। কারণ নাজমা তখনও নাবালিকা। কিন্তু নাজমার বয়স যখন ১৩/১৪ বৎসর

Mamun Academy

হল তখন নাজমার বাপ-মা এ ব্যাপারে আর প্রশ্রয় দিতে পারল না। অথচ এখন আকবর আগের চেয়ে আরও বেশি ঘুর ঘুর করে তাদের বাসার আশেপাশে। নাজমাকে না দেখে সে থাকতে পারে না।

চিন্তিত হয়ে পড়ল নাজমার বাপ-মা। যে কারণেই হোক আকবরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তারা উভয়েই নারাজ। অথচ এখানে বাস করে আকবরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াও অসম্ভব। নাজমাও ক্রমে শশী-কলার মত দিন দিন বেড়ে উঠছে। তাই শেষ পর্যন্ত তারা ঠিক করল যে নাজমাকে নিয়ে তারা দেশে, অর্থাৎ পাকিস্তানে চলে আসবে ও তার বিয়ে না দেয়া পর্যন্ত দেশের বাড়িতেই বসবাস করবে। এতে একদিকে তারা যেমন আকবরের সংস্রব থেকে মুক্তি পাবে, অপরদিকে আবার দেখে শুনে সুন্দরী নাজমাকেও দেশে একটি সৎপাত্রে সমর্পণ করতে পারবে। তবে যাবার ব্যাপারটা তারা যতদূর সম্ভব গোপন রাখল— বিশেষভাবে আকবরের কাছ থেকে।

সব ঠিকঠাক করে ১৯৬৮ সালের ২৫শে জুলাই লতিফ তার পরি-বারের সবাইকে নিয়ে দুবাই থেকে প্লেনে করাচী রওনা হল। ২৬শে জুলাই তারা এসে করাচী পৌঁছল। ভাবল, এবার তারা আকবরের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল।

করাচীতে তারা প্রথমে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে উঠল। সেখানে কয়েকদিন থেকে ১লা আগস্ট তারিখে দেশের বাড়ির উদ্দেশে তারা শাহীন এক্সপ্রেস্ ট্রেনে করে লাহোর রওনা হল।

ট্রেনে ছিল সেদিন খুব ভীড়, তাই নাজমার মা নাজমা ও বাচ্চা-দের নিয়ে মেয়েদের এক কামরায় উঠল, আর লতিফ পাশের একটি পুরুষের কামরায় রইল। কিন্তু করাচী স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে লতিফ আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেল যে স্টেশনের প্ল্যাট-

Mamun Academy

ফর্মে ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আকবর। তবে সেটাকে সে বেশি গুরুত্ব দিল না, ভাবল তারা ত নাজমাকে নিয়ে এখন আকবরের হাতের বাইরেই চলে যাচ্ছে।

ট্রেন যখন টাণ্ডু আদম রেল স্টেশনে পৌঁছল তখন নাজমার মা ছুটে এল লতিফের কামরায় ও ব্যস্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'নাজমা কি তোমার কাছে-এসেছে?'

'কৈ, না ত! সে ত তোমার সঙ্গেই ছিল!' উত্তর দিল লতিফ।

'তা হলে গেল কোথায় সে? করাচীতে ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগে থেকেই তাকে আর আমার কামরায় দেখেছি না। আমি ভাবলাম বুঝি তোমার এখানে চলে এসেছ।'

সেই স্টেশনে অনেক খোঁজা খুঁজি করল তারা নাজমাকে। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেল না। কিভাবে ঠিক কোথা থেকে যে সে উধাও হল তারও কোন সূত্র তারা পেল না। লতিফের মনে পড়ল আকবরকে সে করাচী স্টেশনে একবার মাত্র দেখেছিল। তা হলে কি নাজমা আবার সেই দুষ্ট গ্রহের কবলে পড়ল? ভাবতেই শিউরে উঠল লতিফ।

এখন কি করা যায়? অনিশ্চয়তার মধ্যে এখান থেকে সবাইকে নিয়ে করাচী ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। অগত্যা লতিফ সেই স্টেশন মাস্টারের কাছে ঘটনার একটি বিবরণ দিয়ে সে সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করতে অনুরোধ করে তারা সেই ট্রেনেই লাহোর হয়ে তাদের বাড়ি চলে এল।

বাড়িতে সবাইকে রেখে লতিফ নাজমার খোঁজে ফিরে এল করাচীতে। সেখানে রেলওয়ে পুলিশকে সে বিষয়টি সম্বন্ধে জানাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুলিশ বা রেলওয়ের কেউই এ ব্যাপারে তাকে

Mamun Academy

কোন যথার্থ সাহায্য করতে পারল না। তারা লতিফকেই মেয়ের খোঁজ করতে ও সন্ধান পেলে তাদের জানাতে বলল।

অগত্যা পিতা নিজেই মেয়ের খোঁজ করতে লাগল। প্রায় এক-মাস পরে ২৪শে আগস্ট তারিখে লতিফ খবর পেল যে তার মেয়ে নাজমা গুজরাট জিলায় আকবরের বাড়িতে তার সঙ্গেই বসবাস করছে। এই খবর পেয়েই লতিফ সরাসরি লাহোর হাইকোর্টে এক দরখাস্ত পেশ করে আবেদন জানাল যে তার নাবালিকা মেয়েকে আকবরের কবল থেকে উদ্ধার করে তার হেফাজতে দেয়া হোক।

হাইকোর্ট প্রাথমিক শুনানীর পর লতিফের আবেদন গ্রহণ করে নাজমাকে আকবরের কাছ থেকে এনে কোর্টে হাজির করতে আদেশ জারী করল। কোর্টের একজন কর্মচারী হাইকোর্টের সেই আদেশ নিয়ে গিয়ে হাজির হল আকবরের বাড়িতে। সে সময়ে আকবর বাড়িতে ছিল না, তবে তার পিতা হাইকোর্টের নোটিশ গ্রহণ করে জানিয়ে দিল যে মহামান্য কোর্টের আদেশ অনুযায়ী সে তার পুত্র-বধূ নাজমা ও তার পুত্র আকবরকে যথাসময়ে কোর্টে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে।

নির্ধারিত দিনে নাজমা আকবরের সঙ্গে হাইকোর্টে এসে উপ-স্থিত হল এবং বিচারপতির নিকট এক বিবৃতি দিয়ে জানাল যে সে পহেলা আগস্ট তারিখেই করাচী স্টেশনে তার পিতামাতার আশ্রয় ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় আকবরের সঙ্গে চলে এসেছে। আর সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছাতে নাজমা তার পর পরই করাচীতে বসে আকবর আলীকে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী বিয়ে করেছে। সেই থেকে তারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাসও করছে। নাজমা আরও জানাল যে সে তখনই সাবালিকা ছিল। সে তার নিজ পিতামাতাকে বাদ দিয়েই

Mamun Academy

এই বিয়ে করেছে কেন না সে জানত যে এই বিয়েতে তাদের সম্মতি নেই। এখন তারা সুখে জীবন যাপন করছে এবং নাজমার ওপরে এখন আর তার পিতার কোন অধিকার নেই।

কিন্তু নাজমার পিতার পক্ষ থেকে মহামান্য হাইকোর্টে জানানো হল যে নাজমা মাত্র ১৪ বৎসর বয়স্কা এক নাবালিকা কন্যা। স্বেচ্ছায় বিয়ে করার বয়স বা অধিকার তার এখনও হয়নি। আকবরই নাজমাকে ফুসলিয়ে বের করে নিয়ে গেছে। এখন এক ভুয়া বিয়ের অজুহাত দিয়ে তার গুরুতর অপরাধ গোপন করার চেষ্টা করছে। নাজমা এখনও আকবরের প্রভাবেই রয়েছে। তাই সে সত্যকথা বলতে পারছে না। আকবরের কোন অধিকারই নেই নাজমাকে তার কাছে রাখার এ ক্ষেত্রে নাবালিকা নাজমা একমাত্র তার পিতা-মাতার আশ্রয়েই থাকতে পারে।

অপরপক্ষে আকবরের কৌশুলী কোর্টকে জানাল যে কোর্টে প্রদত্ত নাজমার বিবৃতি থেকেই জানা যায় যে সে স্বেচ্ছায় আকবরকে করাচীতে বসে বিয়ে করেছে ও সেই থেকে তার বৈধ স্বামীর সঙ্গে সুখে বসবাস করছে। আকবরের কোন প্ররোচনা এতে ছিল না। তাদের সে বিয়ে সম্পূর্ণ বৈধ। তাই এখন নাজমার স্বামীই নাজমার হেফাজতের একমাত্র অধিকারী, কারণ বিয়ের পর মেয়ের উপর তার বাবা-মার চাইতে স্বামীর অধিকারই বেশি থাকে।

এই নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে চলল আইনের তুমুল কূটতর্ক।

নাজমার প্রকৃত বয়স কি সেটাই এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। নাজমার পিতার পক্ষ থেকে তার কৌশুলী নাজমার স্কুল সার্টিফিকেট ও পাসপোর্ট ফটো দাখিল করে প্রমাণ করতে প্রয়াস পেল যে নাজমা তখনও মাত্র ১৩ অথবা ১৪ বৎসরের নাবালিকা

কন্যা। যেনাবালিকা কন্যা সে বিবাহিতা হলেও তার হেফাজতের এক মাত্র অধিকারী তার মা। মুসলিম আইনের এটাই বিধান। আর সেই আইন অনুসারেই যতদিন নাজমা সাবালিকা না হয়, ততদিন তার প্রতি অন্য কারও, এমনকি তার স্বামীরও কোন বৈধ অধিকার বর্তায় না।

অতঃপর কোর্টের আদেশে নাজমাকে স্বয়ং বিচারকের সামনে এনে হাজির করা হল।

নাজমার চেহারা দেখে ও সেই সঙ্গে তার স্কুল সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট ইত্যাদি বিবেচনা করে বিচারপতি নিঃসন্দেহ হলেন যে নাজমার বয়স তখন কোন ক্রমেই ১৪ বৎসরের বেশি হতে পারে না। এই বিষয়ে আর কোন ডাক্তারী পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বিচারক দেখতে পেলেন না।

তাই এখন এই প্রশ্নই কেবল থেকে গেল যে, কে এই নাবালিকা নাজমার 'রক্ষণ-অধিকার' পাবার অধিকারী? তার স্বামী না মা?

দেশের আইনের বিধান অনুযায়ী কিন্তু ১৬ বৎসরের কম বয়স্কা সব মেয়েই আইনতঃ নাবালিকা। কিন্তু মুসলিম আইন অনুসারে যখনই স্ত্রী ঋতুমতী হয়, তখন থেকে স্বামীই তার রক্ষণ অধিকার লাভ করে—যদি সে বিবাহিতা হয়। সেক্ষেত্রে তখন থেকে মেয়ের মায়ের আর কোন অধিকার তার ওপরে থাকবে না।

বিয়ের ব্যাপারে একমাত্র নাজমা ও আকবরের বিবৃতি ছাড়া আর কোন সাক্ষী-প্রমাণ কোর্টে উপস্থিত করা হয়নি। যার দ্বারা বোঝা যায় যে নাজমা সত্যি সত্যিই আকবরের বিবাহিতা স্ত্রী। করাচীতে তাদের তথাকথিত বিয়ের প্রমাণ স্বরূপ কোন রেজিস্ট্রীকৃত

Mamun Academy

কাবিননামা হাজির করা হয়নি। তাই তাদের বিয়ে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ অবশ্যই ছিল।

এ ছাড়া বাইরে থেকে নাজমাকে দেখেও মনে হয়েছিল যে তার বয়স তের চৌদ্দ বৎসরের মতই হবে। সে ক্ষেত্রে সে তখনও ঋতুমতী হয়নি বলেই আইনতঃ ধরে নেয়া হয়। এহেন নাবালিকা কন্যার নিজ বিয়ে সম্বন্ধে তার নিজের সাক্ষ্যের ওপরে অতি অল্পই গুরুত্ব দেয়া যায়। কারণ তার সমর্থনে নিরপেক্ষ বা নির্ভরযোগ্য অন্য কোন প্রমাণ হাজির করা হয়নি।

অবশ্য নাজমা সাবালিকা হবার পরও যদি সে বিয়েই সে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেয় তবে অবশ্যই তখন সে তার স্বামীর সঙ্গে যাবার অধিকারী হবে। কিন্তু এতদিন নাবালিকা নাজমা আকবর আলীর সঙ্গে থাকার কারণে স্বভাবতঃই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবে এবং নিজের স্বাধীন সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে থাকবে বলে ধরে নেয়া যায়।

এই সব কিছু বিবেচনা করে মহামান্য বিচারপতি রায় দেন যে আকবর আলী কর্তৃক নাজমাকে আটকে রাখা অবৈধ ও বেআইনী। নাজমার ওপরে আইনতঃ তার কোন অধিকার নেই।

অতঃপর নাজমাকে তার পিতামাতার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ দেয়া হয়। আর সেই আদেশ অনুসারে তখনই নাজমার পিতামাতা তাদের কন্যাকে নিজেদের আশ্রয়ে ফিরিয়ে নেয়।

Mamun Academy

হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ

এক

রতন মোহিনী নগেন্দ্র নারায়ণ

১৯৪৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে হিন্দু আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের এই বিখ্যাত মামলাটির বিচার হয়।

১৮ বৎসর বয়স্কা রূপিনী পরমা সুন্দরী শ্রীমতী রতন মোহিনী দেবী তার স্বামী নগেন্দ্র নারায়ণের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে ১৯৪১ সালে এই বিচিত্র মামলাটি দায়ের করে। বিচিত্র এই কারণে যে তখন হিন্দু আইনে কোন বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল না। অবশ্য বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গে কতগুলো বিশেষ কারণে স্ত্রীরা স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করতে পারে।

১৯২৮ সালের জুলাই মাসে মাত্র ৫ বৎসর বয়সে নগেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে রতন মোহিনীর বিয়ে হয়। কোর্টে তার অভিযোগে সে বলে যে, যদিও সে স্বামীর সঙ্গে এতদিন বসবাস করেছে ও একসঙ্গে রাত্রিযাপন করেছে, কিন্তু তবু আজ ১৮ বৎসর বয়সেও তার কুমারীত্ব ঘোচেনি ; এখন পর্যন্তও সে অনাঘ্রাত কুসুম। কারণ তার স্বামী প্রকৃতপক্ষে বরাবরই পুরুষত্বহীন ও স্ত্রী সহবাসে অক্ষম। এহেন স্বামীর সঙ্গে তার ধর্মতঃ কোন স্থায়ী বিয়েই হতে পারে না। যদিও ১৯২৮ সালে কলকাতায় হিন্দু আইনের বিধান মতে তাদের মধ্যে এক

আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তার স্বামীর অক্ষমতার কারণে সে বিয়েকে প্রকৃত বিয়ে বলা চলে না। তাই সে বিয়ে বাতিল ঘোষণা করার জন্যে বাদিনী কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলা দায়ের করে।

তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ এড-গ্রের কোর্টে এই মামলার বিচার শুরু হয়।

বাদিনী রতনমোহিনীর এই অভিযোগের বিরুদ্ধে বিবাদী নগেন্দ্র কোন আপত্তি দাখিল না করায়, এটা প্রমাণিত হয় যে বিবাদী নগেন্দ্র সত্যিই স্ত্রী-সহবাসে অক্ষম, এবং বিয়ের কাল থেকে এ পর্যন্ত বরাবরই সে ওই অক্ষমতায় ভুগছিল। সে কারণেই বিয়ের পর কখনও বাদিনীর সঙ্গে তার যৌন মিলন হয়নি।

ইংলণ্ডের বা মুসলিম আইন অনুসারে এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী অনায়াসে আইনতঃ বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি পাবার অধিকারী। কিন্তু এই মামলার পক্ষদ্বয় প্রচলিত হিন্দু আইনের দ্বারা বাধ্য, আর হিন্দু আইনের বিধান মতে মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর ন্যায় বিয়েকেও এক অবিচ্ছেদ্য ধর্মীয় সম্বন্ধ হিসাবে গণ্য করা হয়। বিয়েকে হিন্দু আইনে ইংরেজ আইনের মত নিছক একটি চুক্তি হিসাবে কোন মতেই গণ্য করা হয় না। বরং বিয়েকে এমন একটি পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন হিসাবে ধরা হয় যে বন্ধন কোন অবস্থায়ই পরিবর্তন বা বিচ্ছেদযোগ্য নয়। হিন্দু মতে জন্ম মৃত্যুর ওপরে যেমন মানুষের কোন হাত নেই—অর্থাৎ কোন পিতা-মাতার ঘরে শিশুর জন্ম হবে তা নির্বাচন বা নির্ধারণ করার অধিকার যেমন মানুষের নেই ; অনুরূপভাবে তাদের মতে বিয়ের জুটিও ভগবানই আগে থেকেই প্রতিটি নরনারীর জন্যে স্থির করে রাখেন। আর সে কারণেই ভগবান প্রদত্ত ওই জুটি ভাঙবার বা পরিবর্তন করার কোন অধিকার মানুষের নেই। আর এ কারণেই গোঁড়া হিন্দুরা

বিধবা বিবাহও সমর্থন করে না।

এই মামলার আগে কেবল মাত্র যৌন অক্ষমতার কারণে হিন্দু আইনে উচ্চ আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি দিয়েছে বলে কোন পক্ষ কোন নজীর দেখাতে পারেনি।

সুতরাং ইংরেজ বিচারপতি তাঁর সুবিজ্ঞ রায়ে আদিকাল হতে হিন্দু আইন ও পুরনো এ সম্বন্ধে উল্লেখিত বিধানগুলো অতি সুন্দর ও বিশদভাবে আলোচনা করেন।

বিচারক রায়ে বলেন :

'খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে প্রকাশিত 'মণুস্মৃতি' নামক বিখ্যাত ধর্ম পুস্তকে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, যদি কোন খোজা বা নপুংশক ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করে ও বংশ রক্ষার জন্য সন্তান লাভে আগ্রহী হয়, সে ক্ষেত্রে ওই অক্ষম স্বামী নিজ স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষের সহবাসে এনে সন্তান গ্রহণে নিয়োগ করতে পারে। এভাবে পর-পুরুষ দ্বারা সন্তান গ্রহণকে 'নিয়োগ' পদ্ধতি বলা হয়, আর এই প্রথা হিন্দু ধর্মে আদি যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও মণু আরেক স্থানে (৬৪ নং পংক্তিতে) উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের জন্যে এই 'নিয়োগ' ব্যবস্থা অনু-মোদন না করে বলেছেন, 'উচ্চবর্ণের রমণীদের এভাবে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সংসর্গে আসা উচিত নয়। কারণ তাহলে এ দ্বারা প্রচ-লিত আইন ভঙ্গ করা হবে.' তবে মণু সংহিতা থেকে এটা বেশ পরি-কার বোঝা যায় যে অক্ষম স্বামীদের সম্পত্তি নিয়ে তাদের স্ত্রীরা বংশ রক্ষার জন্যে অন্য পুরুষকে সন্তান উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করতে পারে। আর ওই সন্তান অক্ষম স্বামীর সন্তান বলেই বিবেচিত হয়।

এমনকি যদি হিন্দু সমাজেও স্বামীর মৃত্যুর পর পরই তার পরিবা-রের ব্যক্তিদের সম্মতি নিয়ে নিয়োগ পদ্ধতিতে সন্তান উৎপাদনের

Mamun Academy

প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে এ সব বিধান কেবলমাত্র অক্ষম স্বামীর বেলায়ই প্রযোজ্য ছিল।

কিন্তু 'মণু' তার পুস্তকের কোথাও বলেনি যে একজন অক্ষম স্ত্রীর সঙ্গে অক্ষম স্বামীর বিয়ে কেবল স্বামীর অক্ষমতার কারণেই অচল বা বে-আইনী হবে। বরং 'নিয়োগ' পদ্ধতির অনুমোদন থেকে মনে হয় যে এ ধরনের বিয়ে হিন্দু আইনে বৈধ ও প্রচলিত ছিল এবং বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রী দ্বারা অন্য পুরুষের সাহায্যে নিয়োগ পদ্ধতিতে বংশরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই নিয়োগ প্রথা অচল হয়ে পড়ে। বরং দেখা যায় যে পরবর্তী কোন কোন শাস্ত্রবিদদের মতে সঙ্গমে অক্ষম পুরুষেরা বিয়ের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হত।

খৃীঃ দ্বিতীয় শতকে প্রকাশিত 'জ্ঞান ভক্ষ স্মৃতিতে' উল্লেখ আছে যে, বিয়ের আগে বরকে ভালভাবে ডাক্তারী পরীক্ষা করা উচিত ও সে দৈহিক মিলনে সক্ষম কিনা তাও দেখা উচিত। হিন্দু মিতাক্ষরা আইনের বিধান মতে অক্ষম পুরুষ বা নারী কারও পক্ষেই বিয়ে করা শুদ্ধ নয়।

এরপর খৃীঃ চতুর্থ শতকে প্রকাশিত 'নারদা স্মৃতিতে' উল্লেখ আছে :

'বিয়ের আগে পুরুষকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে সে সত্যিই সঙ্গমে সক্ষম কিনা। পরীক্ষায় তার সামর্থ সন্দেহাতীত হওয়ার পরই তাকে বিয়ে করতে দেয়া উচিত—অন্যথায় নয়।'

অন্য স্থানে নারদ বলেছেন :

ভগবান স্ত্রীলোককে সৃষ্টি করেছেন প্রধানত বংশ বিস্তারের জন্যে। স্ত্রীলোক হল জমি আর তার স্বামী হল বীজ বপনকারী।

Mamun Academy

সুতরাং ওই জমির অধিকারী কেবল সেই লোকই হবে যার বীজ বপনের ক্ষমতা আছে। আর যার বীজ নেই সে ওই জমি পাবার অনুপযুক্ত। উর্বরা জমির মালিক হয়ে-তা ফসলশূন্য অবস্থায় ফেলে রাখার অধিকার কোন পুরুষের থাকা উচিত নয়।'

নারদ আরও বলেন :

'যদি স্বামী নিরুদ্দেশ বা মৃত হয় বা যদি সে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে বা যদি সে সঙ্গমে অক্ষম হয় বা যদি তাকে ধর্ম থেকে বহিষ্কার করা হয়—এই পাঁচটির যে কোন একটি কারণের উদ্ভব হলে স্ত্রী পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে।'

আবার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'কুল্লভট্ট' পরিষ্কার বলে গেছেন যে, অক্ষম পুরুষেরা বিয়ে করার অনুপযুক্ত।

এ সম্বন্ধে পরে ডঃ রাজকুমার সর্বাধিকারী বলেছেন :

'স্বামীর ভাইদের নিয়োগ করে অক্ষম পুরুষদের স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান উৎপাদন করার প্রথা সেই কলি যুগ থেকেই অচল হয়ে গেছে। হিন্দু আইনে বর্তমানে এর কোন সমর্থন নেই। যদিও জগন্নাথ পরিষ্কার ভাষায় বলে গেছেন যে ক্রমে ক্রমে মানব জাতি অধঃসম্প্রাপ্ত হয়ে যাবে—যদি না আত্মীয়-স্বজন দ্বারা অক্ষম পুরুষদের স্ত্রীদের পুত্র সন্তান উৎপাদন করার ব্যবস্থা থাকে।'

কিন্তু এই মতের সমর্থনে কোন পরিষ্কার বিধান নেই। আবার এরূপ সন্তান অক্ষম পিতার সম্পত্তির অধিকারী হবে কিনা ও সে পিতার ধর্ম প্রথা পালন করতে পারবে কিনা স সম্বন্ধেও কোন পরিষ্কার নির্দেশ বা সামাজিক প্রথা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

ডঃ সর্বাধিকারীর মতে এরূপ 'ক্ষেত্রজ' সন্তানের প্রথা খুবই

Mamun Academy

খারাপ ও তা সমাজের সুষ্ঠু ও সাধারণ বিধানের পরিপন্থী। এতে বিবাহিতা নারীদের দুশ্চরিত্রা হতে ও পরকীয়াতে উৎসাহ যোগাবে। হিন্দু আইনে বিয়ে দ্বারা বংশ রক্ষা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং বিয়ের বর ও কনে উভয়েই দৈহিক মিলনে সক্ষম কিনা তা দেখতে হবে। যদি তারা সাবালক হয় তবে বিয়ের সময়ে তা দেখতে হবে। আর যদি নাবালক অবস্থায় তাদের বিয়ে হয়, তবে তাদের সাবালক হবার পর দেখতে হবে।

উন্মাদ ও অক্ষম পুরুষের সঙ্গে কোন নারীর বিবাহ-বন্ধন চির-স্থায়ী করতে চাইলে তাদ্বারা স্ত্রীর অসৎ চরিত্রতার পথই উন্মুক্ত করা হবে। তাই এরূপ বিয়ে সাধারণ আইনের বিপরীত। কেবলমাত্র মন্ত্র পাঠ করে বা বিয়ের বাহ্যিক রীতিগুলো পালন করলেই এহেন বিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আদিকালে হিন্দু সমাজে অক্ষম পুরুষদের বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল না, কারণ তখন সেই অবস্থায় স্বামীরা তাদের নিকট আত্মীয়দের সাহায্যে নিয়োগ পদ্ধতিতে স্ত্রী দ্বারা সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হত। কিন্তু বর্তমানে হিন্দু সমাজে আর ওই নিয়োগ পদ্ধতির প্রচলন নেই। তাই এখন আর ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন হিন্দু সমাজ বা ধর্ম অনুমোদন করে না।

এহেন অবস্থায় অনেকের মতে অক্ষম পুরুষের স্ত্রী বা সন্তানহীনা বিধবারা পুনরায় স্বামী গ্রহণের অধিকারী। যদিও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে কোন স্ত্রীর স্বামী অক্ষম হলে উক্ত স্ত্রী সেই স্বামীকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সমাজে এই বিধান আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার রায় বা আইন নেই। এ অবস্থায় আদালত এই মাম-

Mamun Academy

লায় বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় দিতে পারে কিনা সেটাই বিচার্য বিষয়।

সমস্ত আইন ও ধর্মের বিধান আলোচনা করে মাননীয় জজ মিঃ এডরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন :

'এই মামলায় দেখা যায় যে যদিও বাল্যাবস্থায় রতন মোহিনী তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল কিন্তু তবুও এটা পরিষ্কার-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের সেই বিয়ে কোন দিনই সহবাস দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি প্রধানতঃ তার স্বামীর অক্ষমতার কারণে। বর্তমান সমাজে আদিকালের নিয়োগ প্রথার বিলোপ হওয়াতে এখন তাদের এই বিয়েতে সন্তান লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে রতন মোহিনী দেবী বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি পাবার অধিকারিণী।'

এই মামলায় আর এক সমস্যার উদ্ভব হয় যে, বাদিনী তখনও নিজেকে কুমারী বলে ঘোষণা করেছে। সত্যিই রতন মোহিনীর কুমারীত্ব ঘুচেছে কিনা এবং বাদিনী নিজেও পুরুষ সংসর্গে সক্ষম কিনা সেটাও কোর্টের সামনে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করার দায়িত্ব বাদী-পক্ষের ছিল। এটা প্রমাণ করার জন্যে রতন মোহিনী প্রথমে স্বেচ্ছায় নিজেকে ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে রাজি হয়। কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে এতে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করা হয়। তাই রতন মোহিনী তাদের প্রবল চাপে শেষ পর্যন্ত নিজের ডাক্তারী পরীক্ষায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাদিনী বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি পেতে পারে কিনা তা আলোচনা করে জাস্টিস বলেন যে ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়াই বাদিনী তার কেস প্রমাণ করতে পেরেছে এবং সে ১৮ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ সাবালিকা হবার পরেই এই বিবাহ বিচ্ছে-দের মামলা এনেছে। সে কোর্টে আসতেও অহেতুক বিলম্ব করেছে

বলে মনে হয় না। তাছাড়া বিবাদী স্বামী, বাদিনীর ওই অভিযোগ কোর্টে হাজির হয়ে অস্বীকারও করেনি। সুতরাং রতন মোহিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রের বিয়ে হিন্দু আইনেও অচল বলে প্রমাণিত হয়।

অতঃপর বিচারপতি উক্ত-হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে বলে রায় দেন।

দুই
হরিপদ-সুহাসিনী

এই চাঞ্চল্যকর আপীলটি দায়ের করেছিল ১৯৩৯ সালে কলকাতা হাইকোর্টে হরিপদ নামে এক ব্যক্তি তার ভূতপূর্ব স্ত্রী ও স্ত্রীর ২য় স্বামীর বিরুদ্ধে।

হরিপদ রায় সুন্দরী সুহাসিনীকে বিয়ে করে ১৯১৮ সালে হিন্দু শাস্ত্রমতে। বিয়ের সময় সুহাসিনীর বয়স ছিল অল্প। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১১ বৎসর যাবত তারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী রূপে সুখেই বসবাস করে আসছিল। তাদের তিনটি সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে দুটি সন্তান বাল্যাবস্থায়ই মারা যায়, আর তৃতীয়টি মামলা চলার সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল।

১৯৩০ সালের কোন এক সময়ে সুহাসিনী দেবী তার গ্রামের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় তার এক আত্মীয়ের কাছে চলে আসে। সেখানে এসে সে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। সে কলকাতার সরোজ-নলিনী দত্ত স্কুলে ভর্তি হয়। পড়াশুনায় কিন্তু সুহাসিনী খুব ভাল মেধার পরিচয় দেয়, প্রতিটি পরীক্ষায় সে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। স্কুলের পড়া শেষ করে সে পুরী চলে যায় ও সেখানে একটি স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করে।

এর আগে কলকাতায় থাকাকালীনই সুহাসিনী কৃষ্ণবিনোদ নামক

Mamun Academy

এক যুবকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। আর সেই সঙ্গে নিজ স্বামীর প্রতিও তার যেন এক বিতৃষ্ণা জন্মে। হরিপদের সঙ্গ তার আর ভাল লাগে না। বিশেষ করে তাকে এড়াবার জন্যেই সুহাসিনী সুদূর পুরীতে পাড়ি জমায়। বলাবাহুল্য যে এতে কৃষ্ণবিনোদেরও সহযোগিতা ছিল।

কিন্তু সুহাসিনী যে হিন্দু রমণী। তদুপরি হরিপদের সন্তানেরও সে জননী। হিন্দু শাস্ত্রমতে তাদের বিয়ে আমরণ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ হিন্দু আইন অনুসারে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সবই ভগবানের ইচ্ছায় হয়ে থাকে। মানুষের কোন অধিকার নেই যে এতে ইচ্ছামত কোন পরিবর্তন করে।

কিন্তু হলে কি হবে, সুহাসিনী এতদিন পরে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে। তাই সে এই মোহ ত্যাগ করে আবার সেই গ্রামে তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে নারাজ, বিশেষ করে যাকে তার মোটেই পছন্দ নয় তার ঘর পুনরায় সে করতে চায় না। তা ছাড়া ধর্মে অবৈধ হলেও তার মন যে এখন কৃষ্ণবিনোদের জন্যে পাগল।

তবে স্বামী হরিপদ বেঁচে থাকা পর্যন্ত কৃষ্ণবিনোদকে সুহাসিনী আইনতঃ বিয়েও করতে পারে না। এখন কি করা যায়? মহা সমস্যায় পড়ল দুজনে।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে ও নিজেদের মনস্কামনা পূরণ করতে নতুন এক ফন্দি আঁটল দুজনে।

সুহাসিনী ১৯৩৩ সালের মে মাস পর্যন্ত পুরীতে রইল। তারপর একদিন কলকাতা ফিরে এসেই সে হঠাৎ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। ধর্ম ত্যাগের কারণ হিসাবে সে প্রকাশ

করল যে তার বিবাহিত জীবন ছিল অশান্তিময় ও অসহনীয়, একজন নারী হিসাবে নাকি সে হিন্দু ধর্মে ও সমাজে কোন মানসিক সুখ-শান্তি পায়নি। বরং সে এখন বিশ্বাস করে যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সে এক উদার সামাজিক পরিবেশে আসতে পেরেছে এবং এই ধর্মের মহান ছায়াতলে সে সামাজিক নিরাপত্তা ও মানসিক সুখ-শান্তি লাভ করতে পারবে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর সুহাসিনী তার নাম পালটে নতুন নাম গ্রহণ করল সালেহা খাতুন।

এখন সুহাসিনী ওরফে সালেহা থাকবে মুসলমান আর তার স্বামী থাকবে হিন্দু এ ত হতে পারে না। ইসলাম ধর্মের বিধানের তা সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই উকিলের পরামর্শ নিয়ে সালেহা একটি রেজিস্ট্রি চিঠি লিখল তার স্বামী হরিপদ রায়ের বরাবর। সেই চিঠিতে সে হরিপদকেও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান জানাল, তা না হলে তাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হবে না বলেও জানিয়ে দিল সেই পত্রে।

হরিপদ অবশ্য কয়েক বৎসর ধরেই তার স্ত্রীর চলাফেরা ও হাব-ভাবে টের পেয়েছিল শিক্ষিতা হয়ে ও বড় বড় শহরে ঘুরে তার স্ত্রীর কতটা নৈতিক অধঃপতন হয়েছে। এর আগেও সে অনেক চেষ্টা করে তার স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। কিন্তু এই বয়সে হঠাৎ সুহাসিনী পিতৃধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এ সংবাদে সে বিচলিত হয়ে উঠল; বিশেষভাবে হরিপদ ছিল একজন গোঁড়া হিন্দু। আর সুহাসিনী কেবল যে তার স্ত্রীই তাই নয়, তার সন্তানের ও জননী। রাগে ও দুঃখে হরিপদ তার স্ত্রীর চিঠির কোন উত্তরই দিল না।

সুহাসিনীও চাচ্ছিল তাই।

Mamun Academy

অতঃপর স্বামীর কাছ থেকে তার রেজিস্ট্রি করা চিঠির কোন উত্তর না পেয়ে সে আলীপুর জিলা জজের কোর্টে এক আবেদন করে বলল যে সে নিজে স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এখন তার পক্ষে আর হিন্দু স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়, তাই সে তার স্বামী হরিপদকেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান করেছিল। কিন্তু তাতে হরিপদের কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই এখন সে হরিপদের সঙ্গে তার বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করে এই দরখাস্ত পেশ করছে জিলা জজের নিকট—যিনি পদাধিকার বলে জিলা কাজীও বটে।

আলীপুরের জিলা জজ কিন্তু সুহাসিনীর উক্ত আবেদন নাকচ করে দেন এই যুক্তিতে যে বাদিনী ইচ্ছা করলে এ সম্বন্ধে মুন্সেফ কোর্টে যথারীতি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে পারে।

অতঃপর সুহাসিনী ওরফে সালেহা ১৯৩৩ সালের ১৪ই জুন আলীপুর প্রথম মুন্সেফ কোর্টে একটি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করে প্রার্থনা জানাল যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ধর্মীয় ও সামাজিক বাধার কারণে সে আর হিন্দু স্বামী হরিপদের সঙ্গে বসবাস করতে পারে না, তাই সে বিবাহ-বিচ্ছেদ চায়।

যথাসময়ে কোর্ট থেকে স্বামী হরিপদের উপর এই মামলার নোটিশ জারী হল। কিন্তু রাগে ও দুঃখে হরিপদ মামলায় হাজির হল না বা জবাবও দাখিল করল না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সে বছরের ১০ই সেপ্টেম্বর সুহাসিনী ওরফে সালেহা হরিপদের বিরুদ্ধে তার বিবাহ-বিচ্ছেদের একটি একতরফা ডিক্রি (Ex-Parte Degree) লাভ করল। এর ফলে কোর্ট থেকে ঘোষণা করা হল যে উক্ত তারিখ হতে হরিপদের সঙ্গে বাদিনী সুহাসিনী ওরফে সালেহার বিবাহ-

বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

ব্যাপার কিন্তু এখানেই শেষ হল না। ধর্মান্তরকে সুহাসিনী বেছে নিয়েছিল নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধির একটি হাতিয়ার হিসাবে মাত্র, ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নয়। এটা পরিষ্কার হল ডিক্রির তিন মাস পরেই যখন সুহাসিনী আবার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আর্য সমাজভুক্ত বলে ঘোষণা করল। এবং এর পর পরই ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৩৩ সাল) কলকাতার হিন্দু মিশনের সহায়তায় আবার সে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হল। আর সেই দিনই সে তার প্রেমিক কৃষ্ণবিনোদ রায়ের সঙ্গে মন্ত্র পড়ে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। তারপর থেকে এরা উভয়েই হিন্দু আর্য সমাজ ভুক্ত হয়ে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করতে শুরু করল।

ক্রমে ক্রমে এই খবর পৌছল হরিপদের কানে। এবার তার কাছে পরিষ্কার হল তার স্ত্রীর ধর্মান্তরের আসল রহস্য। কৃষ্ণবিনোদের সঙ্গে তার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার যে সব কাহিনী এতদিন তার কাছে পৌঁছেছিল তাও আজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বোঝা গেল যে এরা দুজনে কৌশলে হিন্দুদের মধ্যেও প্রকৃতপক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদ চালু করে নিয়েছে আইনের ফাঁকের আশ্রয় নিয়ে। এবারে আর চুপচাপ না থেকে হরিপদ ও তার সঙ্গীরা সুহাসিনী ও তার নতুন স্বামীকে সমুচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করল। আর এ বিষয়ে তাকে সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা করল হিন্দু সমাজের একটি অংশ।

অচিরেই হরিপদ হিন্দু সুহাসিনীকে তার নিজের বিবাহিত স্ত্রী বলে দাবি করে আলীপুর মুন্সেফ কোর্টে এক মামলা দায়ের করল। বিচারে কিন্তু হরিপদের এই মামলা ডিসমিস হয়ে গেল এই কারণে যে এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আগেই ওই কোর্টের একটি রায়ে সুহাসিনীর

সঙ্গে হরিপদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আর কোর্টের সেই ঘোষণা এখনও বলবৎ আছে যেহেতু হরিপদ সে ডিক্রির বিরুদ্ধে কোন আপীল করেনি।

জজকোর্টে আপীল করল হরিপদ মুন্সেফ কোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেখানেও সে বিফল হল সেই একই কারণে।

হরিপদ ছাড়বার পাত্র নয়। এর পর সে দ্বিতীয় আপীল দায়ের করল কলকাতা হাইকোর্টে।

১৯৩৯ সালের ৯ ও ১০ই মার্চ তারিখে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি জাস্টিস ঘোষ ও জাস্টিস মুখার্জীর কোর্টে এই চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানী হয়।

বাদী হরিপদ রায়ের পক্ষ থেকে তার কৌশুলী যুক্তি প্রদর্শন করে বলল যে (তৎকালীন) হিন্দু আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন স্থানই নেই। তাই সুহাসিনী যেই মাত্র আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে এসেছে, তখনই মুসলমান হিসাবে আদালত থেকে যে বিবাহ-বিচ্ছেদের পূর্বে সে শঠতা করে হাসিল করেছিল, তা আইনতঃ আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেছে ; এখন আর সেই ডিক্রি হরিপদের উপর বাধ্যতামূলক বা প্রযোজ্য নয়। আর ওই একই কারণে সুহাসিনীর সঙ্গে কৃষ্ণবিনোদের পরবর্তী বিয়েও হিন্দু আইন অনুসারে অচল ও বে-আইনী। যতদিন সুহাসিনী মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ছিল কেবল মাত্র ততদিনই হরিপদ ও তার স্ত্রী সুহাসিনীর বিবাহ-বন্ধন তখনকার মত স্থগিত ছিল। এ ছাড়া যেহেতু হিন্দু আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন স্থান নেই, তাই বৃটিশ ভারতে হিন্দুর বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি দিয়ে আলীপুরের মুন্সেফ কোর্ট আইন বিরুদ্ধ কাজ করেছে।

কিন্তু মাননীয় জাস্টিস মুখার্জী আপীলকারী পক্ষের ওই সমস্ত

Mamun Academy

যুক্তিতর্ক খণ্ডন করে বলেন যে সুহাসিনী কর্তৃক দাখিল করা মুন্সেফ কোর্টের পূর্ববর্তী তালাকের মোকদ্দমায় হরিপদকে বিবাদী করা হয়েছিল। কিন্তু হরিপদ সেই মামলায় কোন জবাব দাখিল করেনি বা হাজির হয়নি। আর সেই কারণেই মুন্সেফ কোর্ট তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের স্বপক্ষে একটি একতরফা ডিক্রি প্রদান করে। উক্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা হয়নি। তাই আইনতঃ সে ডিক্রি এখনও বহাল রয়েছে। উভয় পক্ষই উক্ত ডিক্রি দ্বারা অবশ্যই বাধ্য। আর যে পর্যন্ত ওই ডিক্রি বলবত থাকবে ততদিন হরিপদের এই মোকদ্দমা আইনতঃ অচল।

জাস্টিস আরও বলেন যে শ্রী সুহাসিনী ইসলাম ধর্ম ছেড়ে পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করায় হরিপদের সঙ্গে তার পূর্বের বিবাহ বন্ধনও আপনা আপনিই ফিরে এসেছে বলে হরিপদের অ্যাডভোকেট যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা তিনি মেনে নিতে পারেন না; কেননা এমনকি কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেও কোন কোন বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথার প্রচলন রয়েছে।

অতঃপর উভয় জাস্টিস একমত হয়ে ঘোষণা করেন যে হরিপদ ও সুহাসিনীর বিবাহ চিরতরেই বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, আর সেজন্যেই হরিপদ আর সুহাসিনীকে তার বিবাহিতা স্ত্রী বলে দাবি করার অধিকারী নয়।

খৃস্টান ডাইভোর্স

মিস্‌ এলিজাবেথ ছিল সুইজারল্যাণ্ডের মেয়ে। আর মিঃ ভিক্টর লিমা ছিল করাচীর অধিবাসী। উভয়েই রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান। ভিক্টর চাকরি করত করাচীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সেখানকার এক পদস্থ কর্মচারী হিসাবে। ১৯৬৪ সালে ভিক্টর লিমা যায় জেনেভাতে হোটেল পরিচালনায় উচ্চ প্রশিক্ষণ লাভের জন্যে।

জেনেভাতে থাকাকালীন সেখানেই মিস্‌ এলিজাবেথের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়। অচিরেই তাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং উভয়েই উভয়ের প্রেমে পড়ে যায়। বিশেষ ভাবে ভিক্টরই এ ব্যাপারে আগ্রহী হয় বেশি।

ট্রেনিং শেষে ভিক্টর আবার চলে আসে তার কর্মস্থল করাচীতে। কিন্তু এলিজাবেথকে সে মোটেই ভুলতে পারল না। ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সে যখন করাচীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের অফিস ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত ছিল, তখন সে আবার জেনেভায় এলিজাবেথকে অচিরে পাকিস্তানে চলে আসার জন্যে আকুল আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখল। সেই সঙ্গে ভিক্টর তাকে আরও জানাল যে ওই হোটেলেই তার সহকারী হিসাবে একটি চাকরিও সে এলিজাবেথের জন্যে যোগাড় করে রেখেছে।

কিন্তু এলিজাবেথ ভিক্টরের সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে জানাল

যে ঠিক তখনই তার পক্ষে দেশ ত্যাগ সম্ভব হচ্ছে না।

ভিক্টর কিন্তু এলিজাবেথকে পাবার আশা ছাড়ল না। সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে ভিক্টর আবার এলিজাবেথকে চিঠি লিখল তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। উত্তরে এলিজাবেথ জানাল যে বিয়েতে সে-ও আগ্রহী। তবে কিনা সে মনে করে যে বিয়ের মত এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে উভয়েই উভয়কে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানবার প্রয়োজন আছে। তাই এ ব্যাপারে সে তার স্থির সিদ্ধান্ত জানাবার আগে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে উভয়ে উভয়কে আরও ভাল ভাবে জানবার সুযোগ লাভ করতে চায়। আর সেজন্যে সে শিগগিরই প্লেনে করাচী চলে আসছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে সাধারণত বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রচলিত নেই।

১৯৬৬ সালের এপ্রিলে এলিজাবেথ করাচী এসে নামল। ভিক্টর আনন্দের সঙ্গে তাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করল। দুই প্রেমিকের আবার মিলন হল বহুদিন ছাড়াছাড়ির পর। এবার তাদের বিয়ের ব্যাপারে ভিক্টরের যেন আর দেরি সয় না। আগের প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করে এখন সে অচিরেই এলিজাবেথকে বিয়ে করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এবং শেষ পর্যন্ত তেইশে এপ্রিল তারিখে ভিক্টর বহু চেষ্টার পরে এলিজাবেথকে বাধ্য করে তাকে নিয়ে এল এক রোমান ক্যাথলিক গীর্জায়। সেখানে উভয়ে নিজেদের মধ্যে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করল।

বিয়ের আগে কত রঙিন স্বপ্নে বিভোর ছিল দুজনে। হানিমুনের কত প্ল্যান করেছে দুজনে একত্রে বসে। ভিক্টর ছুটি নেবে দীর্ঘদিনের, তারা যাবে মারীর শৈলশিখরে। আবার যাবে পূর্ব বাংলার সবুজ

Mamun Academy

শ্যামলিমায় ঘেরা কক্সবাজারে। সেখানে কপোত-কপোতীর মত দুজনে উড়ে বেড়াবে সাগর বেলায়। স্বপ্নের মত রাতগুলো কাটাবে দুজনে হোটেলে আর মোটেলে।

কিন্তু বিয়ের পরে বাস্তব জগতে পা দিয়েই এলিজাবেথের সব আশা কর্পূরের মত উবে গেল। বিয়ের অনুষ্ঠানের পরই এলিজাবেথ বুঝতে পারল যে তার স্বামী সহবাসে বিমুখ। এমন কি বিয়ের পর থেকেই ভিক্টর সতর্কতার সঙ্গে এলিজাবেথকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে তার ধরা ছোঁয়ার নাগালে থেকেও। একদিন ত শেষ পর্যন্ত সে এলিজাবেথকে বলেই বসল যে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে দৈহিক যোগাযোগ সম্ভব নয়। এর আগেও বিয়ের পূর্ণতা আনার জন্যে কয়েকবারই এলিজাবেথ স্বামী-সহবাসের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিক্টরের অস্বাভাবিক বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পেয়ে সে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। তার স্থির বিশ্বাস জন্মাল যে ভিক্টর নিশ্চয়ই পুরুষত্বহীন ও সে কারণে স্ত্রী-সহবাসে অক্ষম। এই বিয়ের জন্যেই কি সে সাত-সমুদ্র তের নদী পার হয়ে দেশের বাপ-মা আত্মীয়-স্বজনদের মায়া ত্যাগ করে ছুটে এসেছিল সুদূর পাকিস্তানে? বিয়ের এই পরিণতির কথা সে ত স্বপ্নেও চিন্তা করেনি এর আগে। ভিক্টর সম্বন্ধেও তার মন গেল বিষিয়ে। কি দরকার ছিল তার বিয়ে করে একটি কুমারী মেয়ের এভাবে সর্বনাশ করার?

সে ভিক্টরকে ডাক্তারী চিকিৎসার পরামর্শ দিল। ভাবল চিকিৎসার পর হয়ত সে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্ত্রীর সে পরামর্শ ভিক্টর প্রত্যাখ্যান করল।

তবুও এলিজাবেথ কিছুদিন ধৈর্য ধরে রইল। কিন্তু ভিক্টরের ঠাণ্ডা মনোভাব ক্রমে তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। একদিন সে

Mamun Academy

রেগে ভিক্টরকে বলল, 'এই যদি হবে তবে কেন তুমি আমাকে মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে এনে বিয়ে করলে ? কি প্রয়োজন ছিল ওই বিয়ের অনুষ্ঠানের ?' কিন্তু ভিক্টর নীরব।

এলিজাবেথের দৃঢ় ধারণা হল যে ভিক্টর নিজের অক্ষমতার কথা জানা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেছে কেবলমাত্র সামাজিক রীতি পালনের জন্যে ও বাইরে লোক দেখানো স্ত্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। বিপদ হল এই যে, তাদের ধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তদুপরি এখানে সে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া এক বিদেশিনী মহিলা।

দুঃখে শোকে জর্জরিত এলিজাবেথ অতঃপর ১৯৬৬ সালে অক্টোবরের শেষের দিকে মাস দেড়েকের জন্যে সুইজারল্যাণ্ড গেল। যাবার আগে সে ভিক্টরকে জানিয়ে গেল যে সে তার কাছ থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ চায়। এ দয়াটুকু যেন সে তার প্রতি করে। কিন্তু ভিক্টর এবারও নীরব।

কয়েকদিন পরেই এলিজাবেথ সুইজারল্যাণ্ডে বসে ভিক্টরের কাছ থেকে একটি দীর্ঘ চিঠি পেল। তাতে প্রকারান্তরে ভিক্টর নিজের ভুল স্বীকার করে তাকে জানাল যে তাদের বিয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবার উপায় নেই, কারণ সে অক্ষম পুরুষ।

দেড়মাস পরে এলিজাবেথ আবার ফিরে এল করাচীতে। আবার একটানা আটদিন তারা একসঙ্গে রাত্রি যাপন করল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন মিলন সম্ভব হল না। বরং সে সময়ে এলিজাবেথ লক্ষ্য করল যে তার প্রতি ভিক্টর যেন ক্রমেই বিদ্বেষী ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে।

এর পরই করাচী থেকে ভিক্টর ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বদলি হয়। বদলির আদেশ পেয়েই সে এলিজাবেথকে করাচীতে

Mamun Academy

ফেলে রেখে নিজে তাড়াতাড়ি ঢাকা চলে আসে, কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে তার স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা করছে।

অতঃপর এলিজাবেথ করাচীতে আর্চ বিশপের কাছে এক দরখাস্ত দাখিল করল। সেই আবেদনে এলিজাবেথ তাদের বৈবাহিক সমস্ত বিষয় জানিয়ে ধর্মপ্রধান হিসাবে তাঁর কাছে তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রার্থনা জানাল। ভিক্টর ইতিমধ্যে ঢাকায় চলে আসায় এলিজাবেথ ঢাকার আর্চ বিশপের বরাবরও অনুরূপ একটি আবেদন পাঠাল। কিন্তু রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি কঠিন ব্যাপার। তাই আর্চ বিশপেরা এ ব্যাপারে এলিজাবেথকে কোন সক্রিয় সাহায্য করতে পারলেন না।

অবশেষে এলিজাবেথ আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে 'ডাইভোর্স অ্যাক্ট' অনুসারে ঢাকা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করল। উক্ত মামলার আর্জিতে বাদী এলিজাবেথ তাদের অতৃপ্ত বৈবাহিক জীবনের সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে কোর্টের কাছে এই বলে আবেদন জানাল যে বিবাদী ভিক্টরের সঙ্গে তাদের বিয়ের একটি অনুষ্ঠান হয়েছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামী ভিক্টরের অক্ষমতার কারণে তাদের মধ্যে কখনও স্বামী-স্ত্রী সহবাস বা প্রকৃত মিলন হয়নি। বুকভরা অতৃপ্ত কামনা ও বৃথা আশা নিয়েই এলিজাবেথ এতদিন ধৈর্য ধরে ছিল, কিন্তু ভিক্টর সে ব্যাপারে নির্লিপ্ত। এমন কি সে চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার দেখাতেও রাজি নয়। এমতাবস্থায় এলিজাবেথের পক্ষে আর চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয়। সে এখন ভিক্টরের বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি জানাচ্ছে, কারণ অক্ষমতা হেতু ভিক্টর আইনতঃ বিয়ে করার অধিকারী নয়।

সে আরও জানাল যে, তাদের করাচীর বিয়ের অনুষ্ঠানে এলি-

জাবেথের মত নেয়া হয়েছিল তাকে মিথ্যা বুঝিয়ে ও সত্য গোপন করে। ভিক্টরের ঔরসে বাদিনীর কোন সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাই তাদের এহেন বিয়ে স্থায়ী হতে পারে না। এক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর নেই।

ঢাকা হাইকোর্টে এই মামলা দায়ের করার আগে এলিজাবেথের অ্যাডভোকেট ভিক্টরের সঙ্গে তার ঢাকার ঠিকানায় ফোনে যোগাযোগ স্থাপন করে জানতে পারেন যে ভিক্টর ঢাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করছে। উক্ত হোটেলের প্রধান ম্যানেজারের মারফত ভিক্টরের ওপর মামলার নোটিশও জারী করা হল। কিন্তু উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পরও বিবাদী কোর্টে হাজির হল না, বা তার অ্যাডভোকেটের মারফত জবাব দিয়েও তার স্ত্রীর অভিযোগসমূহ অস্বীকার করল না। তা সত্ত্বেও মাননীয় হাইকোর্ট বিবাদীকে অভিযোগ অস্বীকারের সুযোগ দিয়ে আরও তিন সপ্তাহের সময় দেয়। কিন্তু তবুও বিবাদী ভিক্টর তার স্ত্রীর অভিযোগসমূহ অস্বীকার করতে আদালতে হাজির হল না।

ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় জাস্টিস আবদুল্লাহ এই মামলার বিচারের সময়ে বাদিনী এলিজাবেথের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

বিচার শেষে তাঁর রায়ে মাননীয় বিচারপতি বলেন :

ডাইভোর্স অ্যাক্টের ১৮ ও ১৯ ধারা অনুসারে যদি বাদিনী (এলিজাবেথ) প্রমাণ করতে পারে যে তাদের (খ্রীস্ট ধর্মানুযায়ী) বিয়ের সময়ে বিবাদী ভিক্টর অক্ষম পুরুষ (Impotent) ছিল, এবং তার সেই অক্ষমতা মামলা রুজু করার সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তবেই বাদিনী আইনতঃ বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি পাবার অধিকারী, অন্যথায় নয়। এ ক্ষেত্রে বাদিনী স্বয়ং কোর্টে হাজির হয়ে বলেছে যে তাদের ওই

Mamun Academy

বিয়েতে কোনদিন স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন হয়নি এবং যতবারই বাদিনী মিলনের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ও বিবাদীর দিকে এগিয়েছে, ততবারই বিনিময়ে সে স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে প্রত্যাখ্যান ও ভর্ৎসনা। এখন তার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে তার স্বামী অক্ষম। এমনকি এই রোগের চিকিৎসা করার যে প্রস্তাব স্ত্রী দিয়েছিল তা-ও স্বামী গ্রহণ করেনি বরং সেজন্যে বাদিনীকে পেতে হয়েছে স্বামীর গঞ্জনা।

বিয়ের পর সুইজারল্যাণ্ডে এলিজাবেথের নিকট লেখা ভিক্টরের পত্র থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ভিক্টরও প্রকারান্তরে স্বীকার করেছে যে, সে দৈহিক মিলনে অক্ষম। উক্ত পত্রের একস্থানে সে বলেছে, 'আমি নিজেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম এবং আশা করেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত আমার দুঃখের পরিসমাপ্তি হবে ও আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে এবং আমরা সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারলাম যে আমার মাঝে যে আগুন এতদিন জ্বলছিল তা এখনও বর্তমান আছে।' সেই চিঠিরই অন্যস্থানে আছে, 'তুমি আমার স্ত্রী বটে কিন্তু কোনদিনই তুমি আমার একান্ত নিজস্ব হওনি বা আমিও তোমার হতে পারিনি।'

মাননীয় বিচারপতি বলেন, 'এই সমস্ত উক্তি থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে বাদিনী বিবাদীর বিয়ে প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি। আর তার একমাত্র কারণ হল ভিক্টরের দৈহিক অক্ষমতা। এই মোকদ্দমার ঘটনা প্রবাহে ও সাক্ষীতে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে বিয়ের সময় থেকে শুরু করে মামলা রুজুর তারিখ পর্যন্ত ভিক্টর দৈহিক মিলনে অক্ষম ছিল।' এক্ষেত্রে অবশ্য একটি প্রশ্ন যা সবারই মনে জাগে তা হল এহেন অবস্থায় স্বামী ভিক্টর মিস

এলিজাবেথকে. বিয়ে করার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কেন ? বিচারকের মতে হয়ত বিয়ের সময় ভিক্টর জানত না তার ওই অক্ষমতার কথা। আর বিয়ের পরই কেবল সে তার ওই দুর্বলতা টের পেয়েছে যখন সে স্ত্রী সহবাসে অগ্রসর হয়ে বিফল-মনোরথ হয়েছে। আর ডাক্তারী চিকিৎসা করার প্রস্তাবে অস্বীকৃতির কারণ মনে হয় যে এতে ভিক্টরের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল।

উপরোক্ত অবস্থায় মাননীয় বিচারপতি বাদিনী এলিজাবেথকে বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি প্রদান করেন। এবং বাদিনী ও বিবাদীর মধ্যে ১৯৬৬ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত বিয়ে বেআইনী ও বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

Mamun Academy

রক্তাক্ত জলপ্রপাত

চির হিমের দেশ উত্তর মেরু। কানাডার সমগ্র উত্তর অংশে ছড়িয়ে আছে শুধু বরফ আর বরফ। সেই সঙ্গে প্রবাহিত হয় ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া যা পুরু পশমের কোট ও কয়েক ফালি কম্বলের মধ্যেও তীরের মত বিঁধে মানুষের হাড়ে কাঁপুনী ধরায়। এই চির তুষার দেশেই এস্কিমোদের বাস। সমুদ্রে সীলমাছ শিকার ও লোমশ চামড়া সংগ্রহ করেই তারা জীবন ধারণ করে। দক্ষিণের সভ্য সাদা চামড়ার কানাডীয়রা উত্তর মেরুর ওই সব দুর্গম অঞ্চলে যেতই না বলা চলে। তখন সেখানে কেবল এস্কিমোদেরই রাজত্ব ছিল। সভ্যতার বাইরে ছিল তারা, আর সেভাবেই থাকতে তারা পছন্দ করত।

দক্ষিণের সভ্য ও উন্নত লোকদের প্রতি তাদের ছিল অহেতুক ভয়। আর সে কারণেই এস্কিমোদের সাথে দক্ষিণের কানাডার সভ্য লোকদের কোন আদান-প্রদানই ছিল না।

তবে খ্রীস্টান মিশনারীদের কথা আলাদা। খ্রীস্টের অমর বাণী প্রচার করতে তারা পৃথিবীর দুর্গম অঞ্চলসমূহে যেতে কোনদিন পিছপা হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কানাডার ম্যাকেঞ্জি জিলার ক্যাথলিক চার্চের প্রধান ছিলেন স্বনামধন্য বিশপ ব্রেনাট। তিনি ভাবলেন সভ্যতার আলো-বাতাসের বাইরে থাকা উত্তর মেরু অঞ্চলের ওই

Mamun Academy

সব অশিক্ষিত অথচ সাধাসিধে এস্কিমোদের মধ্যে খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য বিস্তার করতে পারলে ধর্ম প্রচারের পথে এক অসাধ্য সাধন হবে। কিন্তু কে যাবে ঐ দুর্গম মেরু অঞ্চলে ? সেখানে ত মাইলের পর মাইল বরফের উপর দিয়ে শুধু পায়ে হাঁটা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

তবে বিশপ ব্রেনাট এটাও জানতেন যে, স্বার্থত্যাগী আদর্শবান মিশনারীদের মধ্যেই এহেন লোক পাওয়া সম্ভব। এর আগেও কয়েকজন মিশনারী উত্তরে গিয়ে এস্কিমোদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রাকৃতিক বাধা এড়িয়ে বেশি-দুর এগুতে পারেননি, অনেকটা বিফল হয়েই ফিরে এসেছিলেন।

১৯১১ সালে বিশপ ব্রেনাট আবার দুজন পাদ্রী নির্বাচিত করলেন এই দুরূহ কাজে। এদের একজন হলেন ফাদার রোভারী, ফ্রান্সের বাসিন্দা, পর্বতারোহণে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অন্যজন ফাদার লি রোক্স, ইনি একজন অল্পবয়সী ইংরেজ।

এরা দুজন অতিকষ্টে কানাডার উত্তরের দুর্গম মেরু অঞ্চলে গিয়ে প্রথম দিকে সুষ্ঠুভাবেই প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু শীতের প্রকোপ একটু কমার সাথে সাথেই যাযাবর এস্কিমোরা আরও উত্তরে উত্তর মেরু সাগরের দিকে এগিয়ে চলল শিকারের সন্ধানে। দুই মিশনারী পাদ্রীও ওদের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিকে এগুতে লাগলেন। কিন্তু সেটাই ছিল তাঁদের শেষ যাত্রা। এর পর থেকে পরবর্তী তিন বৎসর পর্যন্ত বহু চেষ্টা করেও তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অধিকাংশ লোকেই যখন ব্যাপারটা প্রায় ভুলে গিয়েছিল, তখন ১৯১৫ সালে ডি-আর্চি আর্ডেন নামক একজন কাঠ-ব্যবসায়ী কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডিসমাল লেক অঞ্চলে যান। সেখানে তিনি একজন

Mamun Academy

এস্কিমোর গায়ে পাদ্রীদের একটি জামা দেখতে পান। ডি-আচি পাদ্রীদের উধাও হওয়ার সংবাদ জানতেন।

জামাটা আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে ডি-আচি দেখতে পেলেন যে তাতে একটি বুলেটের ছিদ্র রয়েছে।

ডি-আচি আডেনের এই আবিষ্কারের পর পাদ্রী দু'জনের রহস্যজনক অন্তর্ধানের প্রায় ভুলে যাওয়া কাহিনী আবার ঝালিয়ে উঠল। মিশনারীদের অথবা তাদের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার কাজ আবার শুরু হল। খ্যাতনামা পুলিশ ইন্সপেক্টর চার্লস ডিয়ারিং লা-নাউজের উপর পড়ল ওই দুর্গম অঞ্চলের এই দুরূহ রহস্যের তদন্তের ভার।

অতি সুপুরুষ এই লা-নাউজ ছোটকাল থেকেই এসে ফ্রেঞ্চ-কানাডায় বসবাস করছিলেন। উত্তরের মেরু অঞ্চল সম্বন্ধে লা-নাউজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সর্বজনবিদিত ছিল। দীর্ঘ দুই বৎসর উত্তর অঞ্চলে থাকবার মত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন তিনি। সঙ্গে তিনি নিলেন আরও তিনজন লোক: একজন আর্মি কর্পোরাল, একজন পুলিশ কনস্টেবল ও একজন দোভাষী এস্কিমো। বরফের উপর দিয়ে চলার উপযোগী একটি হাল্কা বোটে তাঁরা তাঁদের জিনিসপত্র বোঝাই করে নিলেন ফোর্ট নরম্যান বন্দরে। তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুর্গম যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।

প্রথমেই তাঁরা গ্রেট বিয়ার লেকের দিকে এগিয়ে চললেন। গ্রেট বিয়ারের তীব্র বরফপানির স্রোতের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া খুবই কষ্ট সাধ্য। এমনও স্থান পড়ল যেখানে মাত্র এক মাইল পথ এগুতে তাঁদের চারদিন পর্যন্ত সময় লাগল।

তারপরই শুরু হল উত্তর মেরুর প্রচণ্ড শীত ও হাড় কাঁপানো

Mamun Academy

তীব্র হিমেল হাওয়া আর সেই সঙ্গে বরফ। এ অবস্থায় সামনে এগুনো ত দূরের কথা, জীবন বাঁচানই দায় হয়ে পড়ল লা-নাউজ ও তাঁর সঙ্গীদের। তখন সঙ্গী এস্কিমোর উপদেশ মত তাঁরা লেকের পাড়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সমস্ত শীতকালটা সেখানে কাটিয়ে দিলেন।

পরবর্তী বসন্তের শুরুতেই আবার তাঁদের যাত্রা শুরু হল। সামনে শুধু বরফ আর বরফ, মাইলের পর মাইল ধরে কোন গাছ-পালা—জীবজন্তু বা বাড়ি ঘর চোখে পড়ল না।

এবার তাঁরা কুকুরে টানা গাড়িতে মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে এগুতে লাগলেন। আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে বরফ কেটে এগুতে হল। অবশেষে তাঁরা ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে উত্তর মেরু সাগরের কাছে পৌঁছালে সেখানে লা নাউজ দেখা পেলেন তাঁর বহু প্রতীক্ষিত কর্পোরাল ক্রসের। এই মামলার প্রাথমিক তদন্তের জন্যে ক্রসকে আগেই জাহাজযোগে হারসেল দ্বীপের প্রান্ত ধরে এখানে পাঠান হয়েছিল।

ক্রস কিন্তু এই খুনের তদন্তে বেশ অগ্রসর হয়েছিলেন। নিখোঁজ পাদ্রী রোভারীর নাম খোদাই করা একটি পাদ্রীর পোষাক তিনি এর মধ্যেই উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের খুনের ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি সে যাবত সংগ্রহ করতে পারেননি।

লা-নাউজ কিন্তু হাল না ছেড়ে অশেষ ধৈর্যের সাথে তাঁর এস্কিমো দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে এস্কিমোদের গ্রামে গ্রামে, তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে নিখোঁজ পাদ্রীদের খোঁজ করতে লাগলেন। বহু এস্কিমোকে তাঁরা প্রশ্ন করলেন পাদ্রীদের সম্বন্ধে। কিন্তু সবার কাছ থেকে একই উত্তর; পাদ্রীদের তারা আগে ঠিকই দেখেছিল কিন্তু গত বছর তিনেক যাবত তাদের সম্বন্ধে আর কোন খবর জানে না। কিন্তু তবুও ইন্স-

পেক্টর তাঁর তদন্ত চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অবশেষে নিরাশার আঁধারে একদিন ক্ষীণ আলোর জ্যোতি দেখা গেল। স্থানীয়দের এক তাঁবুতে দোভাষী এস্কিমোর দিকে তাকিয়ে একদিন একজন স্থানীয় এস্কিমো প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা তুমিই কি এ অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ ষ্টিফেন্সনের সঙ্গে আগে কাজ করেছিলে ?'

'হাঁা, আমি তার সঙ্গে ছিলাম,' উত্তর দেয় দোভাষী ইলাভিনিক। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করে সে, 'কিন্তু তুমি তা জানলে কিভাবে ? তোমাকে ত দেখেছি বলে মনে হয় না।'

'আমি আমার চাচার কাছ থেকে তোমার সম্পর্কে শুনেছি, আমার চাচাও সেই সাহেবের সঙ্গে কাজ করত কিনা,' উত্তর দেয় এস্কিমো।

আরও প্রশ্ন করে যেতে লাগল দোভাষী সেই এস্কিমো ও তার দলের লোকদের। পাশে কাছে বসে লা-নাউজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের প্রতি নজর রেখে চলল। দোভাষীর প্রশ্নের উত্তরের এক পর্যায়ে লা-নাউজ লক্ষ্য করল যে ওই এস্কিমো ভয়ে কাঁপছে। লা-নাউজ এবার দোভাষীর সাহায্যে নিজেই তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করল।

শেষ পর্যন্ত বরফ গলল। এর কাছেই জানা গেল যে, নিখোঁজ পাদ্রীদের সে চিনত। এস্কিমোরাই তাদের খুন করেছে। সেজন্যে তারা আন্তরিক দুঃখিত বলেও জানাল। যারা ওই নির্দোষ পাদ্রীদের খুন করেছে তাদের নামও সে বলল।

সিসিনিয়াক ও উলুকস্থকালা। লা-নাউজ আগ্রহের সঙ্গে তার নোট বইতে ওই দুটি নাম, ঠিকানা ও বিবরণ টুকে নিলেন।

অচিরেই সিসিনিয়াকের খোঁজ পাওয়া গেল। এরা পুলিশের লোক জানতে পেরে সে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। তার ধারণা

হল যে তাকে বুঝি পুলিশ এখানেই গুলি করে হত্যা করবে তার দুষ্কর্মের জন্যে।

ওকে একটা তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে লা-নাউজ প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে সিসিনিয়াকের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে তাঁবুটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এস্কিমো অধ্যুষিত ওই গ্রামের তাঁবুর ভেতর ওদের মনোভাব দেখে লা-নাউজ ও তাঁর সঙ্গীরা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের ভয় হল এদের হাতে পড়ে তাঁদের অবস্থাও সেই হতভাগ্য পাদ্রীদের মতই না হয়!

কিন্তু এস্কিমোরা শীঘ্রই বুঝতে পারল যে এই শ্বেতাঙ্গরা এখনই সিসিনিয়াকের ওপর অপরাধের প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে না। বরং তাকে বিচারের জন্যে শহরে নিয়ে যেতে তারা আগ্রহী। গ্রামের মাতব্বরেরা লা-নাউজের এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বলল, 'হাঁ, ঠিকই। সিসিনিয়াক অবশ্যই পুলিশের সঙ্গে শহরে যাবে, তাতে আমরা বাধা দেব না।' এই শুনে লা-নাউজ ও তাঁর দলের সবার মন থেকে এক বিরাট শঙ্কা দূর হয়ে গেল।

এস্কিমোদের সহায়তায় অপর আসামী উলুকস্থকালাকেও পাকড়াও করা হল। প্রকৃত অপরাধীদের ধরে দেবার ব্যাপারে এস্কিমোদের সক্রিয় সহযোগিতা দেখে লা-নাউজ চমৎকৃত হলেন। অতঃপর আসামী দু'জন কোনকিছু গোপন না করে তিন বছর আগের সেই ভয়াবহ ঘটনা বলে গেল নিঃসঙ্কোচে।

প্রথম দিকে মিশনারী দুজনের প্রতি এস্কিমোরা সদয় ও দয়ালু ছিল। স্থানীয় রীতি ও আচার অনুযায়ী তারা তাদের যা কিছু ছিল সমানভাবে ভাগ করে তা ভোগ করতে দিচ্ছিল মিশনারীদেরও। বিনিময়ে কিন্তু ওরা আশা করছিল যে পাদ্রীরাও তাদের সম্পদ

এস্কিমোদের সাথে সমান ভাগে ভাগ করে নেবে। কিছুকাল এ ভাবেই চলছিল নির্বিবাদে।

সে বছর শীত পড়েছিল খুব। ক্রমে স্থানীয়দের প্রধান খাদ্য বলগা হরিণের ভয়ানক অভাব দেখা দিল। প্রচণ্ড শীতও শুরু হয়ে গেল। সমুদ্রের পানি সব জমে ওদেশ এক বিশাল বরফের রাজ্যে পরিণত হল। বাইরে থেকে খাবার আসার উপায় নেই। ফলে সে অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ শুরু হল।

ক্ষুধার্ত হলে মানুষ সব সভ্য আচার ব্যবহার ভুলে যায়। জীবন বাঁচাবার তাগিদে তখনও পাদ্রীদের স্বল্প কিছু খাদ্য সম্বল ছিল তার উপর নজর পড়ল স্থানীয় এস্কিমোদের। পাদ্রীরাও লোকালয় থেকে শত শত মাইল দূরে বরফের রাজ্যের এহেন পরিবেশে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ভয়ানক শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ফাদার রোভারীকে যেখানে হত্যা করা হয় সেখানে কুড়িয়ে পাওয়া তাঁর ডায়েরীর শেষ পাতায় লেখা ছিল : 'এস্কিমোদের এহেন ব্যবহারে আমাদের মোহমুক্তি হল বটে, কিন্তু কি করব আমরা এখন এই অবস্থায় ?'

এই সময় পাদ্রী দুজন কারমিক নামক স্থানীয় একজন ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে একই তাঁবুতে বাস করতেন। কারমিকের খাদ্যের ভাণ্ডারও শূন্য হয়ে এল। ক্ষুধার তাড়নায় কারমিকের স্ত্রী একদিন পাদ্রীদের খাদ্যের শেষ সম্বলে হাত বাড়াল। পাদ্রীরা স্বভাবতই নিজেরা বাঁচবার তাগিদে এতে বাধা দিলেন। রেগে গিয়ে কারমিক দৌড়ে ফাদার লীর রাইফেলটি তুলে নিল হাতে। ফাদার লী তাঁর রাইফেল ফিরিয়ে দেবার দাবি জানালেন। ফলে সেখানে এক গণ্ডগোলের সূত্রপাত হল। রাগের মাথায় কারমিক নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল পাদ্রীর উপর ও তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করল, কিন্তু গ্রামের

Mamun Academy

লোকেরা অতিকষ্টে কারমিককে সেই ঘৃণ্য অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হল। তবে সেই সঙ্গে তারা এ-ও সাব্যস্ত করে দিল যে অতঃপর পাদ্রীদের আর ওখানে থাকা চলবে না। তাদেরকে অচিরেই গ্রাম ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।

গ্রামের শেষ প্রান্ত অবধি এগিয়ে দিতে এসে বিদায়ের পূর্বক্ষণে গ্রামের প্রধান পাদ্রীদের বলল, 'এখানে অবস্থা ভাল হলে আবার আগামী বৎসর আপনারা আসুন।'

শুরু হল দুই হতভাগ্য পাদ্রীর আবার পথ চলা। অচেনা দুর্গম পথ, দুজনই তখন অসুস্থ, খাদ্যাভাবে দুর্বল ও ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ার মত অবস্থা। তবুও জীবন রক্ষার তাগিদে তাঁরা সব বাধা উপেক্ষা করে ঘরে ফেরার আগ্রহে এগুতে লাগলেন। এভাবে তাঁরা নদীর পাশ ধরে দক্ষিণে প্রায় পঁচিশ মাইল পথ এগিয়ে এলেন। এমন সময় শুরু হল তুষার ঝড়। প্রচণ্ড সেই ঝড়ে চাকা চাকা হিমেল তুষার এসে পড়তে লাগল তাঁদের চারদিকে। ফলে ক্ষীণ যে পথটা ছিল তা-ও ভরে গেল তুষারে, পথ চেনার আর উপায় রইল না। গাড়িটি টেনে নিয়ে এগুবার মত শক্তিও তখন আর তাঁদের ছিল না। মৃত্যু যেন তাদের ঘিরে ধরল চারদিক থেকে।

এমন সময় তাঁরা দু'জন এস্কিমোকে দেখতে পেলেন, নাম সিসিনিয়াক ও উলুকসু। এরা তখন নিজেদের গ্রামের দিকে ফিরছিল। পাদ্রীরা তাদেরকে অনুরোধ করলেন তাঁদের স্লেজ গাড়িটা টেনে নিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু এস্কিমোরা জানাল যে তাড়াতাড়ি তাদের গ্রামে ফিরতে হবে, তাই এখন সময় হবে না।

আসামীদের বিবরণমতে পাদ্রীরা এতে ভীষণ রেগে গিয়ে রাইফেল উঠিয়ে ভয় দেখিয়ে ওদের বাধ্য করেন স্লেজ গাড়িটা টেনে

Mamun Academy

নিতে। বিচারের সময়ে সিসিনিয়াক জানায় যে ঠাণ্ডায় তারাও প্রায় জমে যাচ্ছিল। তখন তাদের চলতে বাধ্য করা হয়েছিল গ্রামের বিপরীত দিকে। যখনই তারা বিশ্রামের জন্যে হলেও স্লেজ গাড়িটা টানা থামাচ্ছিল তখনই ফাদার লী রোক্স রাইফেল উঠিয়ে তাদের ভয় দেখাচ্ছিলেন। সিসিনিয়াকের ভাষায়, এহেন অবস্থায় চলতে চলতে আমি উলুকসুককে ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'আমার মনে হয় পাদ্রীরা শেষ পর্যন্ত আমাদের মেরে ফেলবে। তাই নিজেদের বাঁচতে হলে আগে তাদেরই হত্যা করতে হবে।' সেই থেকে আমরা সুযোগ খুঁজতে লাগলাম কিভাবে ওদের দু'জনকেই হত্যা করে আমরা সেই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।'

অবশেষে একবার সুযোগ পেয়ে সিসিনিয়াক তার ধারাল ছোরা দিয়ে পাদ্রী লী'কে পেছন থেকে হঠাৎ আঘাত করে তাঁকে ধরাশায়ী করল। সঙ্গে সঙ্গে সিসিনিয়াক উলুকসুকের দিকে চেয়ে চিৎকার করে বলল, 'তুমি এর বাকিটুকু শেষ কর আমি দেখছি অন্য পাদ্রীকে।'

ছোরাটি আমূল বিঁধে গিয়েছিল পাদ্রী লী'র পিঠে। তিনি আর্ত চিৎকার করে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর পাশ ফিরে ফের উঠবার চেষ্টা করতেই একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উলুকসুক তার শীল মাছ শিকারের তীক্ষ্ণ চাকু বের করে আবার আঘাত করল লী'র উপর। ফলে তিনি আর উঠতে পারলেন না।

এদিকে সিসিনিয়াক দৌড়ে গিয়ে পাদ্রীর রাইফেলটি হাতে তুলে নিয়ে রোভারীর দিকে তাক করে পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল। দুটো গুলিই পাদ্রীর শরীরে বিঁধে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেল।

এভাবে পর পর দুটো খুন করে এস্কিমোরা যেন তাদের জ্ঞান

Mamun Academy

ফিরে গেল। কৃতকর্মের জন্যে তাদের অনুশোচনাও হল কিন্তু তখন আর করার কিছুই ছিল না। এখন এই পাপ ঢাকার জন্যে তারা ব্যাকুল হয়ে পড়ল। ওই আদিম এস্কিমোদের মধ্যে একটা বিশ্বাস ছিল যে মানুষ হত্যার পর তাদের আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ফিরে যায় ও হত্যার কাহিনী প্রকাশ করে দেয়। আর দেহের সাথে ঐ আত্মারও মৃত্যু ঘটানো যায় কেবলমাত্র মৃতের কলজে বের করে তা খেয়ে ফেলতে পারলে। ঐ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তারা তাদের ছুরি দিয়ে মৃত দেহের বুক চিরে ফেলল তারপর পাত্রীদের কলজে বের করে তা খেয়ে নিল। এই ভাবেই ধর্মের পথে শহীদ হলেন দুজন পাত্রী নির্জন এক জলপ্রপাতের নিকটে। পরে ওদের স্মরণে সেই জলপ্রপাতের নাম দেয়া হয়েছিল 'রক্তাক্ত জলপ্রপাত'।

ইন্সপেক্টর লা-নাউজ অতঃপর ঐ দুজন আসামী ও ঘটনা প্রমাণের জন্যে কয়েকজন এস্কিমো সঙ্গী নিয়ে আবার স্বদেশের পথে পা বাড়ালেন। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ দুই বৎসর পরে তারা ফিরে এলেন এডমনটনে। দুই বৎসরের সেই স্মরণীয় অভিযানে লা-নাউজ মোট ৬,০০০ হাজার মাইল অতিক্রম করেছিলেন প্রধানত তুষার মণ্ডিত জনহীন এলাকার উপর দিয়ে।

১৯১৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে এডমনটনে আলবামা রাজ্যের সুপ্রিমকোর্টে তাদের ঐতিহাসিক বিচার শুরু হল। বিপুল জনসমাগম হয় বিচার দেখতে। আসামীরা ইংরেজী এক অক্ষরও বুঝত না। গতানুগতিক শপথ তারা নিতে পারেনি। তবে একথা তারা জানায় যে, তারা সত্য বলবে, কোন কিছু গোপন করবে না। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তারা দোভাষীর মারফত হত্যার সমস্ত বিবরণ

হুবহু বলে গেল। একটুও গোপন করল না। এ মামলা প্রমাণের জন্যে কোন সাক্ষীর আর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে এরাই ছিল শ্বেতাঙ্গদের আদালতে প্রথম এস্কিমো আসামী। জনসাধারণের কাছে এই বিচারের আর একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল এই মামলার প্রধান তদন্তকারী সুদর্শন ইন্সপেক্টর লা-নাউজ। তাঁর সেই কাহিনী এখনও কানাডার সর্বত্র ক্যাম্পফায়ারের আসরের একটি আকর্ষণীয় গাথা হয়ে আছে।

আসামীদের বিচারের সময় এডমনটনের জনসাধারণের মধ্যে শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাস ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করে যে, এই আদিম এস্কিমোরা খুন করার সময় তাদের অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। তিনদিন পরে যখন বিচার শেষ হল তখন এডমনটনের অর্ধেকেরও বেশি জনসাধারণ আন্দোলন শুরু করল আসামীদের নির্দোষ হিসাবে ছেড়ে দেবার জন্যে। এমন কি বিশপ ব্রেনাট যিনি তাঁর পুত্র-সম দুর্ভাগা ওই পাদ্রী দুজনকে পাঠিয়েছিলেন এস্কিমোদের দেশে, এবং এই হত্যাকাণ্ডে যিনি ছিলেন সবচেয়ে ব্যথিত ব্যক্তি, তিনিও তখন উপদেশ দিলেন যে আসামীদের বিচারের পর সরকার যেন তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করেন। স্বয়ং খ্রীস্টের ভাষায় তিনিও বললেন, 'তাদের ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা জানত না কি মারাত্মক অপরাধ তারা করেছে।'

বিচার শেষে জুরীরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে একমত হয়ে বেরিয়ে এল এবং সবাইকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করল—'আসামীরা নির্দোষ।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রধান বিচারপতি মিঃ হারভে জুরীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'জুরী মহোদয়গণ, আপনারা আপনাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। জজ জুরীদের সাথে একমত না হয়ে

Mamun Academy

জুরী ভেঙে দিয়ে আবার আসামীদের বিচারের আদেশ দিলেন। নতুন জুরীরা এবার কিন্তু আসামীদের দোষী বলে ঘোষণা করল অবশ্য। সেই সঙ্গে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আসামীদের প্রতি সর্বাধিক ক্ষমা প্রদর্শনের জন্যেও তারা অভিমত ব্যক্ত করল।

কোর্ট অবশ্য খুনের দায়ে আসামীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করল। তবে সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর জেনারেল ক্ষমা প্রদর্শন করে তাদের জেলের হুকুম দিলেন। আরও আদেশ হল যে তারা সাধারণ জেলে থাকবে না।

অবশ্য বেশিদিন তাদের কারাভোগ করতে হয়নি। প্রধানতঃ ইন্সপেক্টর লা-নাউজের চেষ্টাতেই দেড় বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯১৯ সালে তাদের মুক্তি দিয়ে দেশে ফিরে যেতে দেয়া হয়।

অতঃপর নবজীবন লাভ করে এই এস্কিমো আসামী দু'জন অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে এল তাদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে। এস্কিমোরা প্রথমে কিন্তু ভাবতেও পারেনি যে আসামী উলুকসু ও সিসিনিয়াক আবার কোনদিন বা এত তাড়াতাড়ি তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। তাদের প্রতি দক্ষিণের কানাডীয়দের উদার ও মহান ব্যবহারে এস্কিমোরা মুগ্ধ হল। তাদের অন্তর থেকে শ্বেতাঙ্গ-ভীতি চিরতরে দূর হয়ে গেল।

এরপর থেকে মিশনারী ও শ্বেতাঙ্গরা নিরাপদে উত্তরে যাতায়াত করতে শুরু করল। এস্কিমোরাও অতঃপর নির্ভয়ে দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ অঞ্চলে বেড়াতে আসতে লাগল। ফলে সেই থেকে শুরু হল উত্তরে আদিম অধিবাসী ও দক্ষিণের সভ্য কানাডীয়দের মধ্যে আদান প্রদানের এক নব প্রভাতের সূচনা। উভয় পক্ষই এতে উপকৃত হল। আর এই সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান যাঁর

ছিল তিনি হলেন এই মামলার প্রধান চরিত্র ইন্সপেক্টর লা-নাউজ, কারণ প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় সরকার আসামীদের অত তাড়াতাড়ি মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছিল।

দুজন এস্কিমোর জীবনের বিনিময়ে কানাডা সরকার গোটা এস্কিমো জাতির মন জয় করে নিলেন। আসামীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় সাফল্য।

Mamun Academy

আইনের শাসন

আইনের শাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্যে জাগ্রত বৃটিশ নাগরিকেরা যুগ যুগ ধরে যে লড়াই ও ত্যাগ স্বীকার করে এসেছে তার নজীর পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ইতিহাসে বিরল। আর তাই ইংলণ্ডে আজ কোন লিখিত শাসনতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার না থাকা সত্ত্বেও সেখানকার সর্বোচ্চ সামরিক কমাণ্ড এমনকি স্বয়ং রাজা বা রাণী একজন অতি নগণ্য প্রজারও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা নাগরিক অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করার কথা চিন্তাও করতে পারেন না।

বহু বৎসর আগের বৃটেনের বিখ্যাত 'আর্চার শী' মামলা এই ব্যক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামেরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লেখক আলেকজ্যাণ্ডার উলকট্ সম্প্রতি কোর্টের পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে এই স্মরণীয় মামলার বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন—এই আশায় যে পৃথিবীর সর্বত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রিয় লোকেরা এই অমর কাহিনী পড়বে আর নতুনভাবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবে যে পৃথিবী থেকে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আইনের শাসন যেন কখনও লুপ্ত হয়ে না যায়।

ঘটনাটির সূত্রপাত হয় ১৯০৮ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত আসবোর্নের রয়াল নেভাল কলেজের ১৩ বৎসর বয়স্ক তরুণ ক্যাডেট ছাত্র জর্জকে নিয়ে। জর্জের পিতা মিঃ মার্টিন আর্চার শী ছিলেন লিভারপুলের একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। তাঁর প্রিয় ছেলে জর্জ যেদিন কঠিন প্রতি-

Mamun Academy

যোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে ওই বিখ্যাত নেভাল কলেজে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করল, সেদিন তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিন্তা করে গর্বিত পিতামাতার রঙিন আশার অন্ত ছিল না।

কিন্তু ভর্তি হবার কয়েক মাস পরেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ কমাণ্ড লর্ড অ্যাডমিরালটি থেকে হঠাৎ আর্চার শী একটি চিঠি পেলেন, তাতে তাঁকে জানান হল যে তাঁর ছেলে জর্জকে কলেজ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাই পিতা যেন এসে তাঁর ছেলেকে শিগগির কলেজ থেকে নিয়ে যান। জর্জের পিতামাতার বুকে এই দুঃসংবাদ যেন শেলের মত বিদ্ধ হল।

পিতা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হলেন নেভাল কলেজে। জানতে চাইলেন তাঁর মাসুম ছেলে এমন কি অপরাধ করেছে যার জন্যে তার এই চরম শাস্তি?

উত্তরে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানাল যে একটি ছাত্রের ড্রয়ার থেকে পাঁচ শিলিং-এর একটি পোস্টাল অর্ডার চুরি করার দায়ে জর্জকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাই তার এই শাস্তি।

অভিযোগ শুনে পিতা রেগে গিয়ে ছেলেকে কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'জর্জ, এ অভিযোগ কি সত্য?'

'না বাবা, কখনই নয়। আমি নির্দোষ।' ততধিক দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় ১৩ বৎসরের বালক।

'কেন তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তোমাকে এই অপবাদ ও চরম শাস্তি দিচ্ছে?'

এবার ভেঙে পড়ল জর্জ কান্নায়। দুহাতে মুখ ঢেকে রুদ্ধস্বরে বলল, 'তা ত আমি জানি না।'

অতঃপর ঠিক সেই প্রশ্নই করলেন পিতা কলেজের ভারপ্রাপ্ত

ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন বললেন, 'এ সম্বন্ধে আর কিছু জানাতে আমি অপারগ। প্রয়োজন হলে আপনি লর্ড অ্যাডমিরালটির সঙ্গে এ-ব্যাপারে আরও তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করতে পারেন।'

কিন্তু বিপদগ্রস্ত পিতার বহু চিঠি ও তাগাদা সত্ত্বেও কোন চিঠিরই উত্তর বা তাঁর প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব শক্তিমান লর্ড অ্যাডমিরাল-টির লাল ফিতার দৌরাত্ম্য পেরিয়ে পিতার নিকট এসে পৌঁছল না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এক কথায় লর্ড অ্যাডমিরালটির অফিস থেকে পিতাকে জানান হল, 'কাকে কলেজে রাখা হবে বা হবে না তার এক-মাত্র বিচারক দেশের নৌ-কমাণ্ড। আর কেউ এসম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারে না।'

একজন অত্যাচারিত বৃটিশ নাগরিকের জীবন-মরণ প্রশ্নের আকুল আবেদনে অবশেষে এল শক্তিমান কর্তৃপক্ষের এই ক্ষুদ্র জবাব!—চিঠিটি পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে ভাবলেন পিতা মিঃ আর্চার শী।

এরপর যে কোন সাধারণ নাগরিকই সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে চুপচাপ থাকত, কারণ খোদ্ দেশরক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে এ নিয়ে আরও লড়া সে যুগে ছিল কল্পনাতীত।

কিন্তু পিতার চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর ছেলের কলেজ ত্যাগের শেষ দিনের করুণ দৃশ্য। নিষ্পাপ ছেলে সেদিন কি অসহায় ও করুণ ভাবেই না কেঁদেছিল সারারাত অঝোরে। সেদিনই বাপ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর পুত্র নিরপরাধ। তাই এই কলঙ্কের কালি মুখে নিয়ে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে নিঃসহায় অবস্থায় পৃথিবীতে ছেড়ে দেবেন না।

আর্চার সেদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যতদিন তিনি বেঁচে থাক-বেন আর যে পর্যন্ত তাঁর পকেটে একটি পাউণ্ডও অবশিষ্ট থাকবে, তত-

দিন তিনি চালিয়ে যাবেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনের সংগ্রাম।

তৎকালীন ইংলণ্ডের বিখ্যাত অ্যাডভোকেট স্যার এডওয়ার্ড কারসনের শরণাপন্ন হলেন তিনি। ছেলে জর্জকে নিয়ে গিয়ে একদিন হাজির হলেন স্যার এডওয়ার্ডের চেম্বারে।

নিভৃতে স্যার এডওয়ার্ড নিজে জর্জের বক্তব্য শুনলেন। তারপর ঝানু আইনবিদের মত তীক্ষ্ণ জেরার পর জেরা করে তিনি ওই ক্ষুদ্র বালককে পরাভূত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্যার এডওয়ার্ড বালকের পিঠ চাপড়ে উঠে এসে তার পিতাকে বললেন, 'এ ছেলে সত্যিই চুরি করেনি। আমি এর জন্যে লড়ব।'

একটু থেমে আবার তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'তবে হ্যাঁ, অর্থের জন্যে আমি এই কেস নিচ্ছি না, নিচ্ছি এই জন্যে যে বিচারের কষ্টিপাথরে আমি বিশ্বের সামনে প্রমাণ করব যে এই ছোট বালকটি নিরপরাধ। অথচ এর প্রতি করা হয়েছে চরম অবিচার। অন্যায় কলঙ্কের কালিমা মুছে ফেলে দিয়ে সমাজে উন্নতশিরে বুক ফুলিয়ে চলবার সমান নাগরিক অধিকার আর দশজনের মত এই ইংরেজ বালকেরও রয়েছে।'

স্যার এডওয়ার্ডের এই আশ্বাসবাণী শুনে আশায় ও আনন্দে দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল পিতা মার্টিন আর্চার শীর। তাহলে আরও একজন মানুষ আজ বিশ্বাস করল যে তাঁর ছেলে নির্দোষ। তাঁর পক্ষে এ-ও এক মহা বিজয়। কৃতজ্ঞ পিতা স্যার এডওয়ার্ডকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা পেলেন না।

কিন্তু লর্ড অ্যাডমিরালটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার অনেক বাধা এসে দাঁড়াল।

প্রাথমিক শুনানীর সময় কোর্টে স্যার এডওয়ার্ড এই কেস্ উত্থা-

পন করে বললেন, 'এই ছোট বালক ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হয়ে এক-দিকে বৃটিশ নাগরিকের সাধারণ অধিকারও হারায়, আবার সেই সঙ্গে তখনও পর্যন্ত কমিশন না পাওয়ার কারণে কোর্ট মার্শালেও তার বিচার হতে পারেনি। তাহলে সে কোথায় যাবে? সে কি কোন বিচারই পাবার অধিকারী নয়?'

কোর্টে তৎকালীন সলিসিটার জেনারেল স্যার রুফাস্ আইজাক (পরবর্তীকালে ইনি ইংল্যাণ্ডের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন) স্বভা-বতই এডওয়ার্ডের বিরোধিতা করেন—অবশ্য প্রধান সলিসিটা-রের কর্তব্য হিসাবেই।

শেষ পর্যন্ত এডওয়ার্ড বৃটিশ নাগরিকের শেষ সম্বল আইনগত পুরনো এক অধিকার মূলে দরখাস্ত পেশ করলেন সোজা রাজার কাছে।

এই প্রাচীন আইন মূলে যে কোন অত্যাচারিত বৃটিশ নাগরিক দেশের বিচারের মূল উৎস রাজার নিকট আবেদন করতে পারে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে। আর রাজা যদি সেই দরখাস্তে মাত্র লিখে দেন, 'তার প্রতি ন্যায় বিচার করা হোক (Let right be done)' তাহলে স্বয়ং রাজার বিরুদ্ধেও তাকে সাধারণ বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করে কোর্টে মামলা দায়ের করার অধিকার লাভ করে যে কোন বৃটিশ নাগরিক—আইনের অধিকারের প্রাথমিক কূট তর্ক এড়িয়ে।

অবশেষে Petition of Rights মূলে ১৯১০ সালের জুলাই মাসে, অর্থাৎ ঘটনার ঠিক দুই বৎসর পরে জুরীদের সামনে এই বিখ্যাত আর্চার শী মামলার বিচার শুরু হল।

বিচারের প্রারম্ভে স্যার এডওয়ার্ড জুরীদের সম্বোধন করে বললেন: '১৩ বৎসরের একটি মাসুম বালককে নৌবাহিনী ছাপ মেরে চিহ্নিত

করে দিয়েছে এই বলে যে সে নাকি একজন চোর, একজন জালিয়াৎ! ভদ্র মহোদয়গণ, আমি বালকের প্রতি এই অবিচারের প্রতিবাদ করছি এই কারণে যে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিবরণ তাকে বা তার পিতামাতাকে এমনকি কোন কোর্টকেও এ পর্যন্ত জানান হয়নি যে তারা অভিযোগের উত্তর দেবে। কিন্তু এই বালককে অভিযোগের প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যতবার তার কমাণ্ডার, ক্যাপ্টেন, পিতামাতা, এমনকি আমার নিকট উপস্থিত করে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে ততবারই সে দৃঢ়কণ্ঠে অবিচলিতভাবে জবাব দিয়েছে 'আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে'। আজ সে ন্যায় বিচারপ্রার্থী।

অতঃপর সমগ্র বৃটিশ জাতি ও প্রেস গভীর আগ্রহে শুনতে লাগল এই মামলার গতি ও পরিণতি। মনে হল যেন এই মামলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে ঐতিহ্যবাহী সমগ্র বৃটিশ জাতির ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন, যে প্রশ্নের সঙ্গে কোন আপোষ চলে না।

'কেন এই বালক পাঁচ শিলিং চুরি করতে যাবে? তার নিজের কোন টাকার অভাব ছিল না। অবশ্য যদি সে চৌর্য মনোবৃত্তি নিয়েই ওই পোস্টাল অর্ডার চুরি করে থাকত তাহলে স্বভাবতই সে তৎক্ষণাৎ গোপনে পোস্ট অফিসে গিয়ে সেটা ভাঙিয়ে নিত। কিন্তু তা না করে কেন জর্জ পোস্ট অফিসে যাওয়ার আগে সেদিন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে গেল? আবার অনুমতি পাবার পরেও কেনই বা সে বহুক্ষণ দেরি করে আবার তার একজন সহপাঠীকেও সঙ্গে করে পোস্ট অফিসে নিয়ে গেল সেদিন? জর্জ যদি চোরই হবে তবে তার এহেন অস্বাভাবিক আচরণের কারণ কি? কলেজ কর্তৃপক্ষ কি তা অনুসন্ধান করেছিল?' এই সব প্রশ্ন করলেন স্যার এডওয়ার্ড।

কলেজ রেকর্ড থেকে প্রকাশ পেল যে, ঘটনার দিন ছাত্র টেরেন্স ঝাক্স পাঁচ শিলিং-এর সেই হারানো পোস্টাল অর্ডারটি ডাকে পেয়েছিল। ওটা চুরি যাবার সংবাদ পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে কলেজের চীফ-পোস্ট অফিসার পোস্ট অফিসে ফোন করে জানতে চান যে ওই পোস্টাল অর্ডারটি ভাঙানো হয়েছে কিনা ?

পোস্ট অফিস থেকে উত্তর আসে, 'হ্যাঁ, ওটা মাত্র কিছুক্ষণ আগেই ভাঙান হয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে এ সম্বন্ধে তদন্ত শুরু হয়।

পোস্ট অফিসের প্রধান ক্লার্ক মিস্ আনা ক্লারা টুকারকে প্রশ্ন করে জানা গেল : ওই দিন সকালে পোস্ট অফিসে তার কাছে দুজন ক্যাডেট আসে। তাদের মধ্যে একজন ১৫ শিলিং ৬ পেন্সের একটি পোস্টাল অর্ডার ক্রয় করে। অন্য জন ক্রয় করে মোট ১৪ শিলিং ৯ পেন্সের দুইটি অর্ডার।

'এদের মধ্যে একজন কি হারানো সেই ৫ শিলিং-এর অর্ডারটি ভাঙিয়ে ছিল ?' প্রশ্ন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

'হ্যাঁ, তাই হবে,' উত্তর দেয় মিস্ ক্লারা।

'তুমি কি তাকে দেখলে এখন চিনতে পারবে ?'

'না, সেটা সম্ভব নয়। কারণ ক্যাডেটের পোশাকে এদের সবাইকেই প্রায় একরকম মনে হয়।' উত্তর দেয় ক্লারা। তারপর একটু চিন্তা করে মিস্ ক্লারা বলে, 'তবে এটা আমার মনে আছে, যে-ছেলেটি ১৫ শিলিং ৬ পেন্সের পোস্টাল অর্ডারটি ক্রয় করে সেই ছেলেই চোরাই অর্ডারটি প্রথমে ভাঙিয়েছিল।'

এর পরেই পোস্ট অফিসের রেকর্ড খুঁজে দেখা গেল যে ক্যাডেট জর্জ আর্চার শী ওই ১৫ শিলিং ৬ পেন্সের অর্ডারটি ক্রয় করেছিল।

Mamun Academy

কিন্তু সেই সঙ্গে কলেজ রেজিস্টার থেকে এটাও দেখা গেল যে ওই দিনই সকালে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট গচ্ছিত তার নিজস্ব ফাণ্ড থেকে জর্জ ১৬ শিলিং তুলেছে। একটি ছোট মডেল ইঞ্জিন কেনার জন্যে জর্জ সেদিন পোস্ট অফিসে গিয়েছিল পোস্টাল অর্ডার কিনতে।

মিস্ ক্লারার এই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই কলেজ কর্তৃপক্ষ জর্জকে দোষী সাব্যস্ত করে ও চরম শাস্তিস্বরূপ তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেয়। কিন্তু পরদিন সকালে ক্লারাকে কলেজে এনে ক্যাডেটদের সামনে হাজির করে তাদের মধ্য থেকে দোষী ক্যাডেটকে বেছে বের করতে বলা হলে, ক্লারা তখন জর্জকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই সনাক্তের ব্যর্থতার উপর কোন গুরুত্বই দেয়নি। আর এই সত্যটি প্রকাশিত হয় ঘটনার দুই বৎসর পরে যখন মিস্ ক্লারাকে কোর্টে স্যার এডওয়ার্ডের জেরার সম্মুখীন হতে হল।

কোর্টে জেরার সময় স্যার এডওয়ার্ড ক্লারাকে আরও জিজ্ঞেস করেন :

প্র : ওই দিন, ওই সময় পোস্ট অফিসের ওই সেকশনে আপনি কি একাই কর্মরত ছিলেন ?

উ : হ্যাঁ, আমি একাই তখন সেই কাউন্টারে ছিলাম।

প্র : চোরাই পোস্টাল অর্ডার ভাঙানো, ও ১৫ শিলিং ৬ পেন্সের অর্ডার ক্রয় কি একসঙ্গেই হয়েছিল ?

উ : না, প্রথমে চোরাই অর্ডার ভাঙানো হয়েছিল ও পরে নতুন অর্ডার কেনা হয়েছিল।

প্র : আপনাকে ত সব সময় পোস্ট অফিসের ওই সেকশনের বিভিন্ন কাজে খুব ব্যস্ত থাকতে হত, যেমন টেলিফোন কলের উত্তর

দেয়া, টেলিগ্রাফের তারে যে বার্তা আসত তা রিসিভ করে টুকে নেয়া, আবার চিঠি বাছাই করা ইত্যাদি।

উঃ হ্যাঁ, তখন এসব কাজ আমাকে একলাই করতে হত। আর এ সব নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলার সময়ও থাকত না আমার।

প্র : আহ্, বড় কষ্ট হত আপনার! আচ্ছা, এই সব কাজ করতে করতে ত আপনাকে মাঝে মাঝে কাউন্টার থেকে ভেতরেও যেতে হত, তাই না?

উ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা অবশ্যই যেতে হত।

এরপরেই চতুর এডওয়ার্ড প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে এ-ও হয়ে থাকতে পারে যে সেই মধ্যবর্তী সময়ে আপনার অজ্ঞাতে একজন ক্যাডেট হয়ত কাউন্টার ত্যাগ করে চলে গেছে আর সেখানে অন্য একজন ক্যাডেট এসে দাঁড়িয়েছে?'

উ : হ্যাঁ, তা খুবই সম্ভব।

প্র : আর অত ব্যস্ততার মধ্যে আপনার পক্ষে তা দেখা হয়ত সম্ভব ছিল না, যেহেতু সমস্ত ক্যাডেটদেরই তাদের স্কুলের পোশাকে অনেকটা এক রকমই দেখায়?

উঃ হ্যাঁ, তা অবশ্যই হতে পারে। একথা আমি আগেও বলেছি।

প্র : তাহলে এ-ও ত হতে পারে যে, যে-ছেলেটি চোরাই অর্ডারটি প্রথমে ক্যাশ করেছিল সে চলে গেলে পরে সেই কাউন্টারে জর্জ আর্চার শী এসে দাঁড়ায় ও ১৫ শিলিং ৬ পেন্স-এর পোস্টাল অর্ডারটি ক্রয় করে। এবং এ দুটি কাজ একই ক্যাডেট দ্বারা হয়নি?

উ : তা-ও অবশ্যই হতে পারে। আমি কখনও বলিনি যে একই ক্যাডেট উভয় কাজ করেছে।

ক্লারার এই সাক্ষ্যের পর কলেজ কর্তৃপক্ষের কেসে এক বিরাট

Mamun Academy

ফাঁকের সৃষ্টি হল।

এরপর সরকার পক্ষের অভিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল স্যার রুফস্ এই কেসের পরিণতির কথা সহজেই বুঝতে পারলেন। চতুর্থ দিনে যখন মামলার শুনানী আবার শুরু হল তখন তিনি কোর্টে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন:

'যে সাক্ষী-প্রমাণ এই কেসে এ পর্যন্ত কোর্টের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে তার উপরই ভিত্তি করে লর্ড অ্যাডমিরালটির পক্ষ থেকে আমি জানাচ্ছি যে জর্জ আর্চার শী সত্যিই নির্দোষ। আমরা স্বীকার করছি যে সে চোরাই পোস্টাল অর্ডারে স্বাক্ষর জাল করেনি বা তা ভাঙায়নি। তাই আমরাই তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করছি।'

সরকার পক্ষের এই নাটকীয় ঘোষণার পর পরিপূর্ণ কোর্ট রূম উৎসুক জনতার খুশির কলকাকলিতে ভরে উঠল।

জুরীগণ বেরিয়ে এসে স্যার এডওয়ার্ড ও জর্জের পিতার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে এই বিজয়ে অভিনন্দন জানালেন।

অ্যাডভোকেট স্যার এডওয়ার্ড এ সময় ব্যস্ত হয়ে জর্জকে খুঁজতে লাগলেন তার সঙ্গে করমর্দন করার জন্যে। কিন্তু আশ্চর্য যে কোর্টের কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

কিছুক্ষণ পরে অবশ্য জর্জ দৌড়ে এল স্যার এডওয়ার্ডের চেম্বারে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ জর্জ?' কোর্টে ত কোথাও তোমাকে দেখলাম না! প্রশ্ন করলেন তাকে স্যার এডওয়ার্ড।

মুখ নিচু করে লজ্জিতকণ্ঠে জবাব দিল জর্জ, 'স্যার, গতরাতে আমি থিয়েটারে গিয়েছিলাম, ফিরতে রাত হয়ে যায়, তাই আজ আমি অনেক বেলা করে ঘুম থেকে উঠি। সেজন্যেই আসতে দেরি হল।'

বালকের উত্তর শুনে চমকে উঠলেন স্যার এডওয়ার্ড। 'কি বললে? এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলে তুমি আজ? হায় আল্লাহ! তোমার মামলার চিন্তায় আমি নিজে গত কয়েক সপ্তাহ যাবত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি, আর তুমি কিনা আজ ঘুমুচ্ছিলে এমন নিশ্চিন্তে! তোমার কি একটুকুও চিন্তা ছিল না মনে?'

'মোটেই না, স্যার।' দীপ্তকণ্ঠে উত্তর দিল বালক। 'যে মুহূর্তে এই মামলা কোর্টে এসেছে তখন থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে আদালতে সত্য প্রকাশিত হবেই। আর এখানে শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় অবশ্যই হবে।'

শুনে বিস্মিত দৃষ্টিতে স্যার এডওয়ার্ড তাকালেন বালকের দিকে। দেখলেন তার চোখে মুখে দৃঢ়তার ছাপ পরিস্ফুট। মুগ্ধ হলেন দেখে যে, বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার প্রতি তার কি অটল আস্থা! এহেন মামলায় সফলকাম হয়ে স্যার এডওয়ার্ড সত্যিই আজ মনে এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করলেন।

এই রায়ের পরেই বৃটিশ পার্লামেন্ট চেপে ধরল লর্ড-অ্যাডমিরালটিকে ইংরেজ জনমতের প্রতিধ্বনি তুলে পার্লামেন্ট সদস্যেরা প্রতিশ্রুতি দাবি করল অসবোর্ণ কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে, ভবিষ্যতে আর কোন ছাত্রকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে যেন এ রকম একতরফাভাবে শাস্তি দেয়া না হয়।

কলেজ কর্তৃপক্ষকে পার্লামেন্টের এই রায় অবশ্যই মেনে নিতে হল।

কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসর পরে এই মামলায় জিতেও প্রকৃত কি লাভ হল জর্জ বা তার পিতা আর্চার শীর?

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হবার সময় পেরিয়ে গেছে তখন জর্জের।

Mamun Academy

তাই এখন সেই দ্বার তার জন্যে চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

আর তার পিতা যথা সর্বস্ব খরচ করেছেন এই মামলার পেছনে। আজ তিনি জিতেও রিক্ত, ঋণগ্রস্ত।

অথচ নৌ অ্যাডমিরালটির পক্ষ থেকে কোন ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব এল না। এমন কি একটু দুঃখ প্রকাশও করা হল না এদের প্রতি অন্যায় আচরণের জন্যে।

কিন্তু ইংরেজরা অবিচারের ব্যাপারে চুপ করে থাকার জাত নয়। পরবর্তী মার্চ মাসে জনমতের অতন্দ্র প্রহরী বৃটিশ পার্লামেন্টে আবার এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হল। তারপর সেই অধিবেশনেই লর্ড অ্যাডমিরালটির চৈতন্য উদয়ের জন্যে শেষ পর্যন্ত একটি নিন্দাসূচক প্রস্তাব এনে শাস্তি স্বরূপ ইংলণ্ডের ফার্স্ট লর্ড অ্যাডমিরালটির বেতন ১০০ পাউণ্ড কমিয়ে দেবার প্রস্তাব আনা হল পার্লামেন্টে।

আর ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট হল সার্বভৌম, সেখানে পাশ না হলে দেশে কোন ব্যয়ই সম্ভব নয়। তাই এবার অ্যাডমিরালটির টনক নড়ল। বুঝল একজন সাধারণ বৃটিশ নাগরিকেরও শক্তি কত! একটি ক্ষুদ্র বালকের প্রতিও অন্যায় করে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।

এরপরই প্রতাপশালী অ্যাডমিরালটির ফার্স্ট লর্ড জনগণের দাবির প্রতি নতি স্বীকার করে জর্জের প্রতি অবিচারের জন্যে খোলাখুলি দুঃখ প্রকাশ করল ও সেই সঙ্গে ওদের ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ স্থির করার জন্যে স্যার এডওয়ার্ড সহ তিনজনের একটি কমিটি গঠন করা হল। সেই কমিটির নির্দেশ মতই আর্চারশীদের মোট ৭,১২০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দেয়া হল। আর তারপরই কেবল জনমত শান্ত হল।

মামলার শেষ এখানে হলেও, কাহিনীর জের কিন্তু আরও এগিয়ে গিয়েছিল এক নাটকীয় পরিণতিতে।

Mamun Academy

১৯০৮ সালে জর্জকে অসবোর্ন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। আর ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। ইংলণ্ডের তখন জীবন-মরণ সমস্যা।

নৌ-কলেজে থাকলে ততদিনে জর্জ একজন পুরাদস্তুর নৌ-অফিসার হয়ে বেরিয়ে এসে মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে যুদ্ধে নেমে আত্মোৎসর্গ করার সুযোগ লাভ করতে পারত।

কিন্তু সত্যিই তা-ও সে করেছিল।

১৯১৪ সালে যখন প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, তখন জর্জ ১৯ বৎসরের স্বাস্থ্যবান যুবক। সে তখন চলে গিয়েছিল সুদূর আমেরিকায়। সেখানকার 'ফিকস ও রবিনসন্স' নামক এক বিখ্যাত ফার্মে চাকরি নিয়েছিল মোটা মাইনের।

Mamun Academy

কিন্তু যুদ্ধে জড়িত মাতৃভূমি ইংলণ্ডের দুর্দিনে তার মত সক্ষম যুবক কি দূরে থাকতে পারে? সে বিনা দ্বিধায় সেই লোভনীয় চাকরি ত্যাগ করে ছুটে এল ইংলণ্ডের মাটিতে জাতির সেই ঘোর দুর্দিনে।

তারপর চেষ্টা করে সে সাউথ স্ট্যাফোর্ড শাখার রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করে। স্বল্প ট্রেনিংয়ের পরেই সে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট হিসাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমরক্ষেত্রে।

১৯১৪ সালে অক্টোবরেই তাকে পাঠান হল ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মানদের রুখবার জন্যে। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার বিখ্যাত 'ইপরেস' রণাঙ্গনে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইতে সেই অক্টোবর মাসেই মৃত্যুবরণ করে এই সাহসী যুবক। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মাতৃভূমি রক্ষার মহান কর্তব্যে নিযুক্ত ছিল সে।

এভাবেই অকালে ঝরে পড়ল ইংলণ্ডের একটি অমূল্য জীবন, আজীবন সংগ্রাম করে এবং সত্যের পথে দৃঢ় থেকে। এই সুন্দর পৃথি-

বাঁতে মাত্র ১৯বৎসর বেঁচে ছিল সে।

কিন্তু যতই বৎসর গড়িয়ে যাচ্ছে ততই তার এই ১৯ বৎসরের অমর জীবন-কাহিনী উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে উঠছে কালের ইতিহাসে।

ইংলণ্ডের মত গণতন্ত্রের ঐতিহ্যবাহী দেশেই এ ইতিহাস সৃষ্টি সম্ভব ছিল।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ আজ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার তথা আইনের শাসনকে সবার উপর স্থান দেয়। কারণ আর্চার শীর মত লোকেরা আগুনে পুড়ে অন্য সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্যে সব দেশেই আইনের শাসনের প্রয়োজন কত বেশি। আর আইন ভঙ্গকারী তা যত প্রবলই হোক না কেন, তাকেও কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে আইনের কাছে।

Mamun Academy

ডাকাত

ধূ-ধূ প্রান্তর।

চৈত্রের সন্ধ্যা। চারদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। সেই সঙ্গে লোকের আনাগোনাও থেমে গেছে।

১৯৬৮ সালে কৃষ্ণপক্ষের এক সন্ধ্যার পর, পশ্চিম বাংলা সংলগ্ন সাতক্ষীরা মহকুমার এক বিলের ধারে বিশাল ফাঁকা মাঠের মাঝখানে

যে অশ্বত্থ গাছটি ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে, তারই নিচে এসে জড়ো হতে শুরু করল এক এক করে মোট বারজন পুরুষ। প্রত্যেকেরই হাতে অস্ত্র—কেউ লুকিয়ে এনেছে চাদরের তলে, কেউ বা জামার ভেতরে, কেউ এনেছে বন্দুক, কেউ ছোরা, কেউ রামদা, দুজনের হাতে দেশী হাতবোমা, অন্যদের হাতে পাকা লাঠি। তেল চকচকে শরীর প্রায় প্রত্যেকেরই।

রাত আটটার মধ্যেই পৌঁছে গেল সবাই। দলপতিকে মাঝে রেখে গোল হয়ে বসে গেল সকলে সে রাতের অভিযানের কথা আলোচনা করতে।

দলপতির গলা শোনা গেল। 'তাহলে সবাই তোমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ আমরা প্রস্তুত,' হাত তুলে সায় দিল সকলে। দলপতি চারদিকে তাকিয়ে দেখল সন্ধানী চোখ মেলে। কোথাও আর কোন জনমানবের সাড়া নেই।

এবার গম্ভীর হয়ে দলপতি বলল, 'বেশ, সবাই তোমাদের নিজ নিজ অস্ত্র সামনে রাখ।'

দলপতির নির্দেশ মত সবাই যার যার হাতিয়ার সামনে রাখল।

'কিন্তু আমাদের জন্যে আজ এক দুঃসংবাদ। এত আয়োজন সত্ত্বেও।' অনেকটা হতাশার সুরে এই বলে একটু থামল দলপতি। সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে পরবর্তী অংশ শোনার জন্যে।

'হ্যাঁ, দুঃসংবাদই। আমাদের সবার জন্য মহা দুঃসংবাদ। আজ বিকালেই খবর পেয়েছি যে আমাদের চিড়িয়া হাত ছাড়া হয়ে গেছে। রহিম জোতদার আজ সকালে তার গোলার ধান বেচে সাড়ে তিন হাজার টাকা ঘরে তুলেছিল ঠিকই। কিন্তু ভয়ে সে তা সিন্দুকে

Mamun Academy

না রেখে আজ দুপুরেই সব টাকা নিয়ে সাতক্ষীরা শহরে চলে গেছে সেখানে ব্যাঙ্কে রেখে দিতে। তাই আজ আর সে-বাড়িতে হানা দিয়ে কোন ফায়দা হবে না। ব্যাটা আগে থেকে টের পেয়েই গেল কিনা বুঝলাম না।' দলপতির এই ঘোষণা শুনে সবাই হতাশ হয়ে পড়ল।

'আর হবেই বা না কেন! আজকাল যে ভাবে চোর ডাকাতের দল বেড়ে গেছে তাতে এ ব্যবসায় আর লাভ নেই। আবার অন্য দিকে সুযোগ বুঝে ব্যাঙ্কওয়ালারাও একেবারে ঘরের দরজায় ব্যবসা খুলে বসেছে। কারও হাতে টাকা এসেছে খবর পেলেই ব্যাঙ্কের লোকেরা পাল্লা দিয়ে দৌড়ে আসে। সেই টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কে না ভরা পর্যন্ত তাদের স্বস্তি নেই।' টিপ্পনী কাটল দলেরই একজন ডাকাত।

একটু থেমে সর্দার বলল, 'যাক, যা হবার হয়ে গেছে। আমরা সবাই যখন প্রস্তুত হয়ে এসেছি, চল বরং আর কোথাও হামলা চালাই। কোথায় গেলে ভাল দাঁও মিলবে সেটা চল এখানে বসে আমরা আগেই ঠিক করে নেই।'

'তাই ভাল, আমরা যখন আশা করে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তখন খালি হাতে আর বাড়ি ফিরব না। চল বরং আজ রতন হাজীর বাড়িতে হানা দেই। বেশ মালদার লোক। তার ছেলে বউ সহ ঢাকা থেকে বাড়ি এসেছে। শুনেছি বাড়িতে টাকা-পয়সা-সোনা-দানা অনেক আছে,' প্রস্তাব দিল কালু ডাকাত।

'না না, ও বাড়ি যাওয়া চলবে না। রতন হাজীর বউ আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া।' এই বলে বাধা দিল দলেরই এক প্রবীণ সদস্য।

আর একজন প্রস্তাব করল, 'বরং চল জীবনকৃষ্ণ রায়ের বাড়িতে যাই। তার বাড়িটি যদিও ঘন বসতি এলাকায় তবুও অসুবিধা হবে না।

Mamun Academy

আমাদের সঙ্গে বন্দুক হাতবোমা সবই আছে। তাছাড়া হিন্দু পাড়া, দুটো বোমা ফাটালে কেউ আর ঘরের বার হবে না।'

কিন্তু এই প্রস্তাবও শেষ পর্যন্ত টিকল না দলের আর একজনের ঘোরতর আপত্তির কারণে। সে বলল 'জীবনকৃষ্ণ রায়ের বাড়িতে অন্তত আমি যেতে রাজি নই। ঠেকা-অঠেকায় তার কাছে হাত পাতলে ধার-কর্জ পাওয়া যায়। তার উপর চড়াও হতে আমি পারব না। আর সেখানে আমাকে চিনে ফেলারও সম্ভাবনা আছে।'

ফলে এ প্রস্তাবওবাতিল হল।

আরও দু'একটি সম্ভাব্য স্থান নিয়ে আলোচনা হল। কিন্তু তার কোনটা সম্বন্ধেই দলের সবাই একমত হ'তে পারল না। সর্দারের নির্দেশে সবাই একমত না হলে সেখানে জীবন-মরণের ঝুঁকি নিয়ে এ কাজে যাওয়া চলে না।

শেষ পর্যন্ত সবাই দলপতির উপর ছেড়ে দিল স্থান নির্বাচনের চূড়ান্ত ভার। সে যা বলবে তাতেই সবাইরাজি হবে বলে কথা দিল।

একটু চিন্তা করে দলপতি তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল, 'কোন্ বাড়িতে গেলে কার আপত্তি হবে কে জানে? তার চেয়ে বরং চল এমন এক জায়গায় যাই যেখানে কারও আপত্তি থাকবে না, আবার মালও পাওয়া যাবে ভাল। আজ না রতনপুরের হাট, চল আমরা সেই হাটেই হামলা করি রাত দশটার পর। তখন হাটুরে লোকজনও থাকবে না, বেচাকেনাও শেষ। মহাজনেরা যখন তাদের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখনই আমরা হঠাৎ করে ঢুকেপড়ব সেই হাটে। পাঁচু মহাজনের দোকান আমরা প্রথম ঘেরাও করব, তার সিন্দুকের সব নিয়ে আশেপাশের দোকানগুলোও লুট করব। তবে হ্যাঁ, হাটের ব্যাপার সবাইকে খুব সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে। কেমন, তোমরা

রাজি ?'

সবাই এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। হাট ওখান থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে। যথাসময়ে পৌঁছানোর জন্যে এখনই রওনা হওয়া দরকার। একটা নির্জন পথ বেছে নিয়ে সবাই হাতিয়ার হাতে উঠে পড়ল।

রতনপুর হাটে সেদিন বেচাকেনা সেরে পাঁচু মহাজন তার দোকানের একটি মাত্র দরজা বাদে আর সব দরজা ভিড়িয়ে দিনের হিসাব নিকাশ করতে ব্যস্ত। হাটে আর তখন লোকজন বিশেষ নেই। প্রায় সব ছোট দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল যমদূতের মত চারজন ডাকাত, তাদের হাতে বন্দুক ও ছোরা। 'খবরদার—কেউ একটুও নড়তে বা চিৎকার করতে পারবে না!' শোনা গেল সরদারের দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ এভাবে ডাকাত দল দেখে পাঁচু মহাজন বলির পাঁঠার মত কাঁপতে লাগল। তার কর্মচারী সতীশ দৌড়ে চৌকির নিচে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের এক লাঠির ঘায়ে সে আর্ত-চিৎকার করে মাটিতে বসে পড়ল। ডাকাতেরা চাইবার আগেই ভীতু পাঁচু তার সিন্দুকের চাবি এগিয়ে দিল ডাকাতদের দিকে। কিন্তু ডাকাত সর্দার চাবি না নিয়ে পাঁচুর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে আদেশ দিল, 'যদি প্রাণে বাঁচতে চাস্ তবে নিজে সিন্দুক ও ক্যাশ বাক্স খুলে সব টাকা-পয়সা সোনা-দানা বের করে সামনে রাখ্। দেরি করলে রক্ষা নেই!'

'আমাকে প্রাণে মেরো না, আমি এখনই সব দিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে পাঁচু তার সিন্দুক খুলে সব টাকা-পয়সা সামনে বের করে রাখল। সর্দার তা সব পকেটে পুরতে লাগল। সেই ঘরের পেছনের দিকে ছিল এক ছোট্ট দরজা, তার সঙ্গেই একটি ছোট্ট কুঠরি। সেখানে

Mamun Academy

থাকত পাচুর সাহসী এক জোয়ান কর্মচারী আবদুল। সেই দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছিল কালু ডাকাত। হাতে তার একটি হাত বোমা। কালুর লোলুপ দৃষ্টি তখন সিন্দুক থেকে বের করে রাখা নোটের তোড়ার দিকে। আবদুল সে সময় ভেতরে খাবার খেতে বসেছিল।

মহাজনের ঘরে হৈ চৈ শুনে আবদুল চুপিসারে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। দরজাটা একটু ফাঁক করেই দেখতে পেল তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এক ডাকাত, তার হাতে গোল একটা কি যেন, এ ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। ডাকাতটিকে কাবু করবার এই সুযোগ আবদুল ছাড়তে চাইল না। সে মাজায় কষে কাপড় বেঁধে হঠাৎ কপাট খুলে ডাকাতকে পেছন থেকে জাপটে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে নিয়ে এল নিজ কামরার ভেতরে। তারপরই এক ঝাঁকিতে ডাকাতকে সে ফেলে দিল মাটিতে। এত হঠাৎ ও প্রচণ্ড হয়েছিল আবদুলের আক্রমণ যে ডাকাত নিজেকে সামলাবার সুযোগ পেল না। তার হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল একটি দেশী হাত বোমা। হাতে রাখা অবস্থায়ই কালু বোমাসহ ধপাস করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। আর সেই আঘাতে তার ডান হাতের মধ্যেই ফেটে গেল বোমাটি সশব্দে। সঙ্গে সঙ্গে কালুর ডান হাতের কব্জির উপর থেকে সব আঙ্গুলসহ তালু পর্যন্ত উড়ে গেল। অবশ্য বোমার টুকরার আঘাতে আবদুলও আহত হল। দুজনেরই ক্ষত জায়গা থেকে দরদরিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল কিন্তু তবুও ওদের ধস্তাধস্তি চলতেই থাকল। এক পর্যায়ে আবদুল ডাকাতকে মাটিতে চেপে ধরে তার বুকের উপর উঠে বসে গলা টিপে ধরল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল কালু ডাকাত। আর একটু হলেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে-

Mamun Academy

ছিল আর কি? হঠাৎ একটি লাঠির আঘাত এসে লাগল আবছুলের মাথায়। সে ঘুরে পড়ে গেল পাশে। আর তার নিচ থেকে কালু ডাকাতকে টেনে তুলল তারই সঙ্গী আর ছুজন ডাকাত।

এমন সময় বাইরে পরপর কয়েকবার বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেল। বোমা ফাটার শব্দও হল সেই সাথে। এতে আশেপাশে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে পাঁচু মহাজনের দোকানের চারপাশে লোকজন জমতে শুরু করল।

ডাকাতদল দেখল সমূহবিপদ। তারা আর দেরি না করে আহত কালু ডাকাতকে ধরাধরি করে নিয়ে বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাট থেকে বেরিয়ে এল। ওদের এলোপাথাড়ি ছোড়াবন্দুকের গুলিতে একজন স্থানীয় লোক আহতও হল। ফলে ভয় পেয়ে জনসাধারণ কেবল দূর থেকে ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করতে লাগল। সেই অন্ধকার রাত্রে তারা ডাকাতদের বেশি কাছে এগুতে পারল না।

আহত কালুকে সঙ্গে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ডাকাত দল প্রায় ছুই মাইল দূরে এসে একটু থামল। আহত কালু ডাকাতের হাত দিয়ে ক্রমাগতই রক্ত ঝরছে. ক্রমেই সে ছুর্বল হয়ে পড়ছে। হেঁটে চলার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলছিল সে। তাকে নিয়ে হল ডাকাতদলের সমূহ বিপদ। কালুকে সঙ্গে নিতে হলে তাকে ঘাড়ে করবার জন্যে ছুজন লোকের দরকার। এতে তাদের পালাবার গতিও অনেক কমে যাবে। তাছাড়া ওর হাত যে-ভাবে বোমার আঘাতে থেঁতলে ছিঁড়ে গেছে, তাতে ওকে কোথাও চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাওয়াও বিপদজনক। পুলিশ ওই সূত্র ধরে সমগ্র দলটির সন্ধান পেতে পারে। কি করা যায় কালুকে নিয়ে? এ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে সর্দারের আদেশে সবাই একটা নির্জন স্থানে থামল।

ডাকাতদের আইনে দলের কেউ মারাত্মকভাবে আহত হলে, দলের বাকি সবার নিরাপত্তার জন্যে তাকে নিজেরাই হত্যা করে ফেলবার বিধান আছে। তাছাড়া এমনকি তার মৃত লাশও যাতে কেউ সনাক্ত করতে না পারে সেজন্যে তাও বিকৃত করে সাধারণত গুম করে ফেলা হয়। নতুবা জীবিত এমনকি মৃত অবস্থায় সেই ডাকাত ধরা পড়লে বা তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে দলের সবাইকেই পুলিশ ধরে ফেলতে পারে।

কালুর যে রকম রক্তক্ষরণ হচ্ছিল ও তার হাত বোমার আঘাতে যে ভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে গেছে, তাতে যে কারও তাকে দেখলেই রতনপুর হাটের ডাকাত দলের লোক বলে চিনতে মোটেই কষ্ট হবে না। তাই দলের অনেকেই প্রস্তাব করল যে কালুকে এই অবস্থায় আর টানা হ্যাঁচড়া না করে একেবারে খতম করে ফেলাই ভাল। দলের সবার স্বার্থে এটাই করা দরকার।

এতক্ষণ কালু প্রচণ্ড বেদনা ও দুর্বলতায় কাহিল হয়ে মাটিতে শুয়েছিল। এই আলোচনার বিষয় শুনে সে ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দলের দুজন বাদে আর সবাই একমত হয়ে গেছে যে আহত কালুকে ওখানেই মেরে ফেলে তার লাশ গুম করে ফেলা হবে। তারপর আজকের অল্প কিছু যা টাকা-পয়সা পাওয়া গেছে তা ভাগ করে নিয়ে তারা নিজ নিজ বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকবে কিছুদিন। কালুর ওপর দলের লোকের রাগের আর একটা কারণ হল, তার বোকামির ফলেই আজ এই অঘটন ঘটেছে। বোমার আওয়াজ শুনে যে ভাবে চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছিল তাতে আর একটু দেরি হলেই তারা প্রায় সবাই ধরা পড়ে যেত। কালু সতর্ক থাকলে মাত্র একজন লোক তাকে ওভাবে হঠাৎ আক্রমণ করে কাবু

Mamun Academy

করতে পারত না।

অবশ্য তখনও দলে কালুর হুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তারা এক-মত হতে পারছিল না কালুকে হত্যা করার নৃশংস প্রস্তাবে। তাদের যুক্তি, এভাবে বিপদের মুখে দলের একজনকে বাঁচাবার চেষ্টা না করে তাকে মেরে ফেলা ঠিক হবে না—বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে যে শুধু তার ডান হাতই মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চিকিৎসার সুযোগ পেলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। আর তাড়া বোকামির উপ-যুক্ত সাজা ত সে পেয়েই গেছে।

এ সময় কালুও কোন রকমে উঠে এসে দলপতির পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। কাকুতি-মিনতি করে বলল, 'আমাকে প্রাণে মেরো না, দয়া করে আমাকে বাঁচতে দাও। আমি সারা জীবন তোমাদের গোলাম হয়ে থাকবো। আমার কারণে তোমরা কেউ যাতে ধরা না পড় সেজন্যে আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করতে রাজি আছি। আমার হাতের চিকিৎসার দরকার নেই। আমি ডাক্তারের কাছে যাব না, ঘরে বসে কেবল মায়ের সেবাতেই এই ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারব।'

তারপর সে অতিকষ্টে আহত হাতটা তুলে ধরে বলল, 'এই দেখ রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস কিছুদিন বিশ্রাম পেলেই আমি সেরে উঠব। তোমরা আমাকে এভাবে মেরে ফেল না। আমার প্রাণ ভিক্ষা চাই তোমাদের কাছে। আমাকে শুধু আমার মার কাছে দিয়ে এসো।'

কালুর কান্নায় সবার মনে দয়ার উদ্রেক হল। দলপতি চিন্তা করে বলল, 'বেশ তোমাকে আমরা বাঁচতে দিতে পারি দুটি শর্তে: প্রথমতঃ তোমার ওই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাত এখানেই কেটে ফেলতে হবে

Mamun Academy

যাতে বোমার আঘাতে তোমার হাত যে উড়ে গেছে তা লোকে দেখলেও হঠাৎ টের না পায়। তোমাকে আমরা কালই বর্ডার পার করে ভারতে পৌঁছিয়ে দেব। পশ্চিমবঙ্গের কোন হাসপাতালে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে নেবে। তা হলে তুমি এখানকার পুলিশের ছোঁয়ারও বাইরে থাকবে।'

সর্দারের এই প্রস্তাবে কালু রাজি হয়ে গেল। আপাতত তার প্রাণ রক্ষা হল, এতেই সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

ঠিক হল সেখানেই ওর ক্ষত স্থানের ওপর থেকে, অর্থাৎ কব্জির উপরে হাতের পাতা কেটে বাদ দেয়া হবে। কিন্তু সমস্যা হল কি-ভাবে ওটা কাটা যায়। ডাক্তারের কাছে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। তখন দলের এক-উৎসাহী ডাকাত উঠে বলল, 'আমি রাম-দায়ের এক আঘাতে ওর হাতটুকু কেটে বাদ দিয়ে দিতে পারি।'

সবাই সায় দিল এ প্রস্তাবে।

আর দেরি না করে এখনই কাজটা সমাধা করতে হয়। কাছেই ছিল গাছের একটা উঁচু শিকড়, সেখানে নিয়ে যাওয়া হল কালুকে। একজন ওর চোখ চেপে ধরল। তারপর আহত হাতটা সেই শিক-ড়ের ওপরে রেখে ভারি ধারাল রামদা দিয়ে সজোরে দেয়া হল এক কোপ। চিৎকার করে উঠল কালু, আর কব্জি থেকে তার খণ্ডিত হাত-টুকু ছিটকে পড়ল দূরে। আবার ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল কাটা হাত থেকে। কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়া হল ক্ষত স্থানটা। মাটিতে গর্ত করে সেখানে পুঁতে রাখা হল খণ্ডিত হাতের অংশটুকু যাতে কেউ তা খুঁজে না পায়।

কঠোর পদ্ধতির এই অপারেশনে দুর্বল কালু আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। তাকে মাটিতে শুইয়ে কিছুক্ষণ শুশ্রূষা করার পরে আবার

তার জ্ঞান ফিরে এল। হাত একটা গেলেও সে যে এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছে এটাই তার বড় সান্ত্বনা। ঠিক হল পরদিনই কালুকে বর্ডার পার করে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়া হবে।

পরদিন হাত তার ভয়ানক ফুলে উঠল আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে লাগল সে। কিন্তু তবুও তাকে শান্তিতে থাকতে দিল না তার সঙ্গীরা। সেই অবস্থাতেই পরদিন রাত্রে তারা তাকে জোর করে দিয়ে এল বর্ডারে। তারপর পশ্চিমবঙ্গের একটা ছোট্ট হাসপাতালের নিকট পৌঁছে দিয়ে সঙ্গীরা ফিরে এল।

পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল অনেকটা মানবতার কারণে। তার হাতের ক্ষতস্থানে ভালভাবে ঔষধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হল। ইনজেকশনও দেয়া হল। কিন্তু তবুও বেদনা, কোলা বা জ্বর কমল না। কয়েকদিন পর দেখা গেল তার ক্ষতস্থানে পচন শুরু হয়েছে। যে অস্ত্র দিয়ে তার হাত কাটা হয়েছিল তা বিষাক্ত ছিল, আর সেই বিষেই ক্ষতস্থানও বিষাক্ত হয়ে গেছে। ওর অবস্থা গুরুতর দেখে কালুকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে দুরারোগ্য গ্যাংগ্রিন ব্যাধিতে তার ডান হাত আক্রান্ত হয়েছে। তাই হাসপাতালে অপারেশন করে তার হাতের বাহু পর্যন্ত কেটে বাদ দেয়া হল। আরও সপ্তাহ দুই সে রইল কলকাতার হাসপাতালে কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন বাহু পেরিয়ে আগেই গ্যাংগ্রিনের বিষ তার সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন এর আক্রমণ থেকে বাঁচার আর কোন উপায় নেই।

রোগীর বাড়ি বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) জেনে সেখানকার ডাক্তারেরা তাকে উপদেশ দিলেন দেশে ফিরে গিয়ে সে

Mamun Academy

যেন তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই বাস করে। জীবনের যা কিছু কামনা-বাসনা আছে তা-ও যেন সেই সময়ে পূরণ করে নেয়। কারণ অলৌকিক কিছু না ঘটলে তার বাঁচবার মেয়াদ আর মাত্র দুই-এক সপ্তাহ। তবে দেশে আত্মীয়-স্বজনের সেবা শুশ্রূষায় হয়ত ফল হতে পারে।

ডাক্তারের এই মতামতের পর কালুর মনও দেশে ফেরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। জীবন সম্বন্ধে এর মধ্যেই সে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল, এখন দেশের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারলেই সে শান্তি পায়।

অনেক কষ্টে সে আবার ফিরে এল নিজ বাড়িতে। এতদিন পরে তার মা তাকে ফিরে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। মা ভেবেছিল কালু ডাকাতি করতে গিয়ে মারা পড়েছে। প্রকৃত পক্ষে তার দলের লোকেরাও এসে ওর মাকে তাই বলেছিল। সেই থেকে মায়ের চোখের অশ্রুও আর থামেনি। হতে পারে কালু ডাকাত, কিন্তু তার ত ছেলে। দীর্ঘ দশমাস পেটে ধরে তিলে তিলে তাকে গড়ে তুলেছে মা। আজ অপ্রত্যাশিতভাবে তার হারানো মাণিক বুকে ফিরে পেয়ে মা মহাখুশি হল। বার-বার শপথ করাল কালুকে আর যেন কখনও সে দলে না ভেড়ে। না খেয়ে থাকবে তারা তবুও ডাকাতির পয়সা নেবে না। কালুও মাকে সেই মত প্রতিশ্রুতি দিল।

মার কোলে ফিরে এসে এখন তার বাঁচবার সাধ আরও বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে বিগত পাপের জন্যে অনুশোচনায় তার মন ভরে গেল। সে প্রতিজ্ঞা করল যাদের জন্যে তার আজ এই দুর্গতি সেই ডাকাত দলকে সে ক্ষমা করবে না। তাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারলে সে মরেও শান্তি পাবে এই জেনে যে, সে শেষ পর্যন্ত তার পাপের কিঞ্চিত প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছে। এর জন্য তাকে যে শাস্তি পেতে হয় তা

সে মাথা পেতে নেবে।

বাড়ি ফেরার পর দুই দিনে মায়ের সেবায় একটু সুস্থ হয়ে উঠল কালু। কিন্তু তার পরই আবার আরম্ভ হল ভয়ানক জ্বর ও বেদনা। কাটা বাহুর নিচ থেকে সমস্ত ডান পাশ ফুলে প্রথমে লাল ও পরে কালো হতে শুরু করল। কালু বুঝতে পারল কলকাতার ডাক্তারদের সেই ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হতে চলেছে। দিন তার ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু মরার আগে ডাকাত দলকে ধরিয়ে দিতে হবে পুলিশের হাতে। তাদের কারণেই তাকে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে অকালে বিদায় নিতে হচ্ছে। সে মহকুমা সদরে যাওয়া ঠিক করল।...তার মাও তাকে উপদেশ দিল শহরের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ভালভাবে চিকিৎসা করাতে।

সেদিন অতি কষ্টে কালু যখন মহকুমা সদরে পৌঁছল তখন রাত প্রায় নটা। সেই রাতেই সে গিয়ে উঠল তার পুরনো মোক্তার বিশু বাবুর বাড়িতে। বিশু মোক্তার তখন সমস্ত কাজকর্ম সেরে উঠবার উপক্রম করছিলেন। এমন সময় তাঁর পুরনো মক্কেল কালু গিয়ে হাজির। গায়ে কম্বল জড়ানো। ঘরে ঢুকেই সে ধপ করে বসে পড়ল একটি চৌকিতে। তার শরীর ও মুখের চেহারা দেখে চমকে উঠলেন বিশু বাবু। আগে কয়েকবারই ওর মামলা করেছেন তিনি. বহু টাকাও নিয়েছেন কালুর কাছ থেকে। কয়েকবার জামিন হয়ে তাকে মুক্তও করেছেন হাজত থেকে। কিন্তু ডাকাত হলেও কালু কখনও মোক্তারের অর্থ ফাঁকি দেয়নি বা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। তাই তার প্রতি একটু বেশি দরদ ছিল মোক্তার বাবুর।

সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী যুবক কালুর আজকের চেহারা দেখে ভয়ানক দুঃখ পেলেন বিশু মোক্তার। বোঝা গেল যমের সাথে সর্বক্ষণ

Mamun Academy

লড়াই করে চলেছে সে। ওর হাত কাটা দেখে আরও চিন্তিত হলেন মোক্তার।

'একটু বসুন, মোক্তার বাবু, আপনার সঙ্গে আজ আমার জরুরী কথা আছে।' এই বলে কালু চেয়ে দেখল আর কেউ নেই ঘরের মধ্যে। এবার শুরু করল কালু :

এই শহরে আপনাকেই ভালভাবে চিনি ও বিশ্বাস করি তাই আজ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আপনার কাছেই ছুটে এসেছি। আশা করি আপনি আমাকে সাহস যোগাবেন।'

বাধা দিয়ে বিশু মোক্তার বললেন, 'তার আগে বল তোমাকে আজ একি অবস্থায় দেখছি।'

'সব আপনাকে বলব বলেই এখানে এসেছি আজ। এবার আমি আমার এতদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। যাদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় আজ আমার এ অবস্থা, তাদের যাতে সাজা হয় তা-ই আমি আজ দেখতে চাই। আপনি আমাকে কোন হাকিমের কাছে নিয়ে চলুন। আমার স্বীকারোক্তিটি তিনি যেন লিখে নেন ও ডাকাত দলের সবাইকে ধরে সাজা দেন।'

'বেশ ত, নেয়া যাবে। কিন্তু আগে আমাকে বল, কি বলতে চাও তুমি হাকিমের কাছে।'

'তাহলে শুনুন।' এই বলে কালু সেই বটতলা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সবকিছু বলে গেল মোক্তারের কাছে। তার দলের সব ডাকাতের নাম-ধামও বলে দিল সে—যদিও কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল কালুর। যখন সে শেষ করল তখন রাত প্রায় দশটা। তন্ময় হয়ে বিশু মোক্তার শুনলেন সেই কাহিনীটি মৃত্যুপথ যাত্রী ডাকাতের মুখ থেকে। এতবড় একটা ডাকাতদল ধরিয়ে দেয়ার এই মোক্ষম

Mamun Academy

সুযোগের সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন, কিন্তু তখন রাত অনেক হয়ে গেছে। এত রাতে হাকিমের কাছে যেয়ে তাঁকে বিরক্ত করা যুক্তি-সঙ্গত হবে না। তিনি ভাবলেন এক রাতে আর কি হবে? কাল ভোরেই তাকে উপস্থিত করবেন হাকিমের সামনে।

এদিকে কালুর অবস্থা তখন খুব খারাপ। সে আর বসে থাকতে না পেরে শুয়ে পড়ল মোক্তারের চৌকিতে। বিশু বাবু তার কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠলেন। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর। মহকুমা হাসপাতালের ডাক্তার তাঁর বিশেষ পরিচিত ছিল। তিনি সেই রাত্রেই কালুকে হাসপাতালে ভর্তি হতে উপদেশ দিয়ে অভয় দিলেন যে তার কাহিনী তিনি মন দিয়ে শুনেছেন। পরদিন খুব ভোরেই তিনি দারোগা ও হাকিমকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারের সাক্ষাতে হাসপাতালে বসেই তার সব স্বীকারোক্তি হাকিমকে দিয়ে রেকর্ড করিয়ে দলের সকল ডাকাতকেই ধরাবার ব্যবস্থা করবেন।

মোক্তার বাবু ডাক্তারকে একটি চিঠি লিখে দিলেন কালুর হাতে তাকে ভর্তি করে নেবার জন্যে। তারপর একটি রিক্সার তাকে তুলে দিয়ে রিক্সাওয়ালাকে বললেন কালুকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে।

যাবার সময় কেবল কালু বলে গেল, 'বাবু আমার মন বলছে—আমি আর বেশি সময় বাঁচব না। ইচ্ছে ছিল যে আজকেই আপনি স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নিন। তাহলে শান্তি পেতাম। মরণেও আমার দুঃখ থাকত না। যাক তা যখন হল না। কাল খুব ভোরে আসবেন কিন্তু।' ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বিশু বাবু বললেন, 'তুমি আজ রাতে বিশ্রাম নাও হাসপাতালে, কোন চিন্তা করো না। আমরা খুব ভোরেই আসছি।' কিন্তু হায়, তখন কি মোক্তার বাবু জানতেন, কি মারাত্মক ভুল সে রাতে তিনি করলেন?

Mamun Academy

রাতে কিন্তু বিশু বাবুর ভাল ঘুম হল না। খুব ভোরে উঠেই তিনি দৌড়ে গেলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায়। কাছেই থাকতেন মহকুমা সেকেণ্ড অফিসার। সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সব শুনে মহকুমার ত্রাস সৃষ্টিকারী ডাকাতদলকে ধরবার এই পরম সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি থানার দারোগাকে হাসপাতালে আসার জন্যে খবর দিয়ে বিশু মোক্তারকে নিয়ে ছুটে এলেন হাসপাতালে, সেখানে বসেই কালু ডাকাতের স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার জন্যে।

হাসপাতালে এসে কালুর খোঁজ করতেই জানা গেল যে কালু শেষ রাত্রেই হাসপাতালে মারা গেছে।

বিস্মিত হয়ে মোক্তার বাবু ডাক্তারকে বললেন, 'এরই মধ্যেই সে মারা গেল! অথচ কাল রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত সে আমার চেম্বারে ছিল। তখন দিব্যি কথা বলছিল সে!'

ডাক্তার বললেন, 'গতরাতে আপনার চিঠি পেয়ে যখন তাকে ভর্তি করি তখনই অবস্থা খুব খারাপ ছিল। মারাত্মক গ্যাংগ্রিনের বিষ তার সারাদেহে ছড়িয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি যে সে মারা যাবে তা আমিও ভাবিনি। শেষ রাত্রে যখন খবর পেলাম তার অবস্থা খুবই খারাপ, আমি বাসা থেকে ছুটে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছিলাম, কিন্তু তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। ফজরের আগেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।'

নার্স বলল, 'শেষের দিকে অজ্ঞান অবস্থায় সে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল আর বিশু মোক্তারের নামও কয়েকবার উচ্চারণ করেছিল।'

শুনে সবাই আফসোস করতে লাগল।

সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় এই যে বিশু মোক্তার গতরাত্রে কালুর দলের ডাকাতদের নাম ঠিকানা লিখে রাখেন নি। এখন আর সব নাম তিনি মনেও করতে পারলেন না। তাই পুলিশও কোন সূত্র পেল না তাদের ধরার। যদি রাতেই কালুকে হাকিমের সামনে হাজির করতেন তবে তার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেই হাকিম সাহেব দলের আর ডাকাতদের নাম-ধাম সব পেয়ে যেতেন। কেন তিনি তা করলেন না! বিশু মোক্তার কপালে করাঘাত করতে লাগলেন।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। এখন আর হা-হুতাশ করা বৃথা। অন্তরের অতৃপ্ত বাসনা ও বহু না বলা কথা নিয়েই কালু চলে গেছে অনেক দূরে—মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তার নশ্বর প্রাণহীন দেহটি শুধু পড়ে আছে হাসপাতালের বিছানায় হাকিম, পুলিশ, ডাক্তার, সকলের সামনে।

কুখ্যাত এক সংঘবদ্ধ ডাকাতদল ধরবার এতবড় একটা সুযোগ নষ্ট হওয়ায় নিরাশ হল সবাই।'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও অগত্যা বিষন্ন মনে পা বাড়ালেন তার বাসার দিকে।

বাদল দিনের এক সন্ধ্যায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এই কাহিনীটি আমাকে বলেছিলেন তৎকালীন মহকুমা সেকেণ্ড অফিসার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মিনহাজ উদ্দীন সাহেব আমারই ড্রইং রূমে বসে চা খেতে খেতে।

আদালত অবমাননা

মহামান্য হাইকোর্ট অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত মিঃ এডওয়ার্ড স্নেলসনের কেসটি শুধু এই উপমহাদেশেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বের আইন-ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

স্যার এডওয়ার্ড স্নেলসন ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারী, প্রায় ১২ বৎসর যাবৎ এই ইংরেজ সিভিলিয়ান এদেশে ওই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসন আমলের গোড়ার যুগ। তৎকালীন মার্শাল ল'-এর ভয়ে সবাই ভীত ও সন্ত্রস্ত। দেশে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়েছে, তবে দেশকে অরাজকতার কবল থেকে রেহাই দেবার জন্যে ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট একটি অর্ডার জারী করে ঘোষণা করেন যে পাকিস্তান যত দূর সম্ভব ভূতপূর্ব শাসনতন্ত্র দ্বারাই শাসিত হতে থাকবে যতদিন না নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি হয়।

তখন সবেমাত্র পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে সেকশন অফিসার-এর প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছে। ৮০ জন তরুণ শিক্ষানবীশ সেকশন অফিসার ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে রাওয়ালপিণ্ডিতে ট্রেনিংরত ছিলেন। ১৯৬০ সালের ১৫ ই ফেব্রয়ারী মিঃ স্নেলসন করাচী থেকে রাওয়ালপিণ্ডি এসে ওই শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র

Mamun Academy

(Transitional constitition) সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরবর্তী কালে ল' সেক্রেটারীর অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে উক্ত বক্তৃতার আরও ২০০০ কপি সরকারী প্রেসে ছাপিয়ে, তা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে, বিদেশের পাকিস্তান দূতাবাসগুলোতে, শিক্ষানবীশ পরীক্ষার্থী ও অন্যান্য সেকশন অফিসারদের মধ্যেও বিতরণ করা হয়।

সেই বক্তৃতার একটি ছাপানো কপি প্রাদেশিক সরকার ১৯৬০ সালের ১০ই অক্টোবর পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের নিকট পাঠিয়ে দেন হাইকোর্টের জজদের অবগতির জন্যে। রেজি-স্ট্রার যথাযথভাবে ওই বিবৃতি প্রথমে লাহোর বেঞ্চের সকল হাই-কোর্টে জজদের নিকট পাঠিয়ে দেন। বিবৃতির ৯ ও ১০ নং প্যারা পাঠ করে মাননীয় বিচারপতিগণ উহা কোর্টের উপর আক্রমণ ও আদালত অবমাননাকর বলে মনে করেন। অতঃপর ২৫শে অক্টোবর (১৯৬০ সাল) লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতিগণ একত্রে মিলিত হয়ে আলোচনা করে এ সম্বন্ধে একমত হন যে ওই বিবৃতির ৯ ও ১০ নং অনুচ্ছেদে কেবলমাত্র অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়নি বরং এর দ্বারা দেশের উচ্চ আদালত হাইকোর্টকেও শ্রোতা ও পাঠকদের সামনে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আরও সাব্যস্ত হয় যে ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন অনুসারে মিঃ স্নেলসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতঃপর একজন সিনিয়র জাস্টিস মিঃ সাব্বির আহমদ বিবাদী মিঃ স্নেলসনের উপর হাইকোর্টের এক রুল জারী করে আদেশ দিলেন যে তাকে ১৪/১১/৬০ তারিখে স্বয়ং হাইকোর্টে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে কৈফিয়ত দাখিল করতে হবে।

Mamun Academy

উক্ত ৯ ও ১০ নং প্যারাগ্রাফে নেলসন ইংরেজীতে যা বলেছিলেন তার বঙ্গানুবাদ নিচে দেয়া গেল :

'৯' 'আমি আশা করি আপনারা সকলেই রীট সম্বন্ধে অবগত আছেন। আইন দফতর একে 'বিশেষ অধিকারের রীট' বলে মনে করে। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হাইকোর্ট এই রীটের অধীনে বহু আদেশনামা সরকারের উপর জারী করেছেন। তারা মনে করেন যে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে তাদের এই অধিকার দেয়া হয়েছে যার বলে তারা স্বয়ং সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা (হাইকোর্ট) ওই বিশেষ অধিকারের পরিমিত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কোন কোর্ট রীট জারী করতে পারে কেবলমাত্র সেই অধিকারে যে, সর্ব শক্তিসম্পন্ন শাসক (Sovereign) ওই ক্ষমতা কোর্টকে অর্পণ করেছেন। সুতরাং পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী (কোর্ট) সেই ক্ষমতা দ্বারা খোদ সরকারের বিরুদ্ধেই ওই রীট প্রয়োগ করার অধিকারী নন, এর যৌক্তিকতা ইংলণ্ডে বিগত শত শত বৎসরের কোর্টের রুলিঙ-এ স্থিরীকৃত হয়ে আছে ওই দেশে রাজার অর্পিত শক্তির বলেই কোর্ট রীটের অধিকারী হয়েছে। আমেরিকাতেও এই ব্যবস্থাই চালু আছে। সেখানে দেশের সর্বশক্তি জনসাধারণের হাতেই ন্যস্ত। এবং সেই দেশের প্রেসিডেন্ট মারফত ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার একজন জজ বলেছেন, 'দেশে দুইটি সার্বভৌম শাসক থাকতে পারে না। এবং সার্বভৌম শাসক তার নিজের বিরুদ্ধে কোন রীট জারী করতেও পারে না।' অতঃপর এ ব্যাপারে ল' মিনিস্ট্রিকে বহুবার সুপ্রীম কোর্টে আপীল দায়ের করতে হয়েছে। (হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে) প্রকৃত আইনগত অবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে। এবং

Mamun Academy

মাত্র একটি কেস্ ব্যতীত সবগুলোতেই আমরা সফলকাম হয়েছি। কিন্তু এ সবে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে; তাই আর টাকা খরচ ও আপীল দায়ের না করে অবস্থা সঠিক পথে আনার জন্যে পরিবর্তনশীল নতুন শাসনতন্ত্রে একটি ধারা (নতুন) যোগ করে দেয়া হয়েছে যাতে হাইকোর্টকে কেবলমাত্র কতগুলো বিশেষ ব্যাপারেই 'ম্যাণ্ডেমাস' (Mandamus) রীট জারী করার অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন আদেশ (Orders or direction) জারী করার অধিকার হাইকোর্টকে দেয়া হয়নি। এটা করা হয়েছে যথাসম্ভব ভদ্রভাবে (Politely) বুঝিয়ে দেবার জন্যে (হাইকোর্টকে) যে একটি রীট কেবলমাত্র একটি রীটই বটে—এবং তা তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। আর এর বাইরে যাবার অধিকার তার (হাইকোর্টের) নেই। কিন্তু তবুও এটা আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে এই ভদ্র ব্যবহার সত্ত্বেও (civility) আমরা এ পর্যন্ত সফলকাম হতে পারিনি। একদিকে এই নতুন ধারা অন্যদিকে সুপ্রীম কোর্টের কতগুলো কড়া মন্তব্য দ্বারা (হাইকোর্টের প্রতি) অন্তত এইটুকু বুঝাতে সক্ষম হয়েছি যে সবকিছুরই সীমা আছে, এবং সেই সীমা মেনে চলা সবারই উচিত। প্রতিটি সরকারের প্রধান প্রয়োজন হল এর সব অঙ্গ সুশৃঙ্খলভাবে নিজ নিজ কাজ করে যাবে। সকলের আরও জানা দরকার যে তাদের প্রকৃত কাজ কি আর তার পরিসীমাই বা কতদূর। এটা মেনে নিলেই অযথা কাজ ও গণ্ডগোল এড়িয়ে চলা যায়। না হলে আসে অহেতুক বাধা। একে-অন্যের কাজে মাথা গলানোর অভ্যাস ও তার ফলে অনিশ্চয়তা। আর এ সবের ফলেই সৃষ্টি হয় সবরকমের সাধারণ বিশৃঙ্খলা ও সাধারণের দুর্দশা।'

উক্ত বক্তৃতার ১০ নং প্যারাগ্রাফে মিঃ স্নেলসন আরও বলেন

Mamun Academy

যে :

',০' এই 'আদেশ' বুঝাবার জন্যে আপনাদের এত সময় নেয়ার কারণে আমি ক্ষমা চাচ্ছি, কিন্তু এটাই হল নতুন শাসনতন্ত্র না হওয়া পর্যন্ত নতুন সরকারের মূল ভিত্তি। আপনারা বোধহয় চাকরির শর্ত সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে শুনতে আগ্রহী। আগের শাসনতন্ত্রে এ সম্বন্ধে মাত্র একটি প্যারা ছিল (৬ ধারা)। কিন্তু এখন তাতে আরও ছয়টি প্যারা যোগ করা হয়েছে। এতে চাকরির শর্তাবলীর অনেক সংশোধন করা হয়েছে, কিন্তু সবগুলো নয়। এর একটি শর্ত দ্বারা সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে (কর্মচারীদের) চাকরির মেয়াদ বর্ধিত করার। হাইকোর্ট এই ক্ষমতা এতদিন অস্বীকার করে আসছিল। কিন্তু তার সেই রায় আমাদের কোনদিনই বোধগম্য হয়নি। আমরা অবশ্যই এর (ওই রায়ের) বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করতাম, এবং আমার মোটেও সন্দেহ নেই যে তাতে আমরা জয়ীও হতাম, কিন্তু তার সময় ছিল না; কারণ এই সময়ে বিদেশী একটি ঋণ (আমাদের) দেয়া হয়েছিল—এই শর্তে যে কয়েকজন কর্মচারীকে চাকরিতে বহাল রাখতে হবে। কিন্তু যেহেতু হাইকোর্ট তাদের চাকরিতে বহাল রাখার অধিকার অস্বীকার করে, আর তখন আমাদের পক্ষে আপীল করে মাসের পর মাস (আপীলের রায়ের জন্যে) বসে থাকার সময়ও ছিল না। তাই সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে সরকারের এই (চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির) ক্ষমতা রয়েছে। আমরা কাজ করার এই বিশেষ পথ বেছে নিলাম। এই কারণে আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে আমরা আদালতের রায় সত্ত্বেও কোন প্রকারে মেনে নিতে পারছিলাম না যে সেই ক্ষমতা আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে। আপীল দায়ের করার অধিকার ছাড়াও

আমরা বলছি যে ওই ক্ষমতা সরকারের অবশ্যই আছে।'

হাইকোর্টের নোটিশ পেয়েই মিঃ স্লেলসন সেই নোটিশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল দায়ের করার জন্যে বিশেষ অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেই অনুমতির দরখাস্তে তিনি সুপ্রীম কোর্টকে জানালেন যে তিনি কোন অন্যায় করেন নি। বক্তৃতাটি তিনি গোপনে সরকারী কর্মচারীদের সামনে দিয়েছিলেন। বরং হাইকোর্টই এ ব্যাপারে তাঁর উপর নোটিশ জারী করে অন্যায় করেছে, আর জিনিসটি তখনই সাধারণের কাছে প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে হাইকোর্টই সরকারী গোপনীয় আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী।

সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য মিঃ স্লেলসনের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে দিয়ে বলেন যে হাইকোর্টের সম্পূর্ণ এখতিয়ার আছে তাঁর বিরুদ্ধে এই নোটিশ প্রদানের এবং তাঁকে আইনতঃ হাইকোর্টের সামনে হাজির হতে হবে। এই অবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

হাইকোর্ট থেকে প্রথমে কেবলমাত্র মিঃ স্লেলসনের উপরই 'শো কজ' নোটিশ জারী করা হয়। এবং চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে এর কপি অ্যাডভোকেট জেনারেলকেও দেয়া হয় যাতে তিনি বিবাদীর বিরুদ্ধে সরকারের তরফ থেকে মামলা পরিচালনা করেন। কারণ দেশের হাইকোর্টের অবমাননা সরকারের নিজস্ব অবমাননা। ইচ্ছা করেই বিবৃতি ছাপাকারীর উপর কোন নোটিশ দেয়া হয়নি—এই কারণে যে ল' সেক্রেটারী মিঃ স্লেলসন আইন বিভাগের একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী। এক্ষেত্রে তাঁর বিবৃতি তাঁরই আদেশে ছাপিয়ে দেশের কোন আইন ভঙ্গ হতে পারে, স্বভাবতই সে চিন্তা ছাপাকারীদের মনে আসেনি।

যেহেতু মিঃ স্নেলসন ছিলেন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের একজন অতি উচ্চ পদস্থ কর্মচারী (ল' সেক্রেটারী) তাই তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা বিচারের জন্যে তৎকালীন চীফ জাস্টিস লাহোর কোর্টের তিন জন সিনিয়ার বিচারপতি দিয়ে একটি ফুল বেঞ্চ গঠন করার আদেশ দেন। এই বেঞ্চে ছিলেন জাস্টিস মিঃ সাব্বির আহমেদ, জাস্টিস মিঃ আচিসন, ও জাস্টিস মিঃ ইয়াকুব আলী।

১৯৬০ সালের ১৪ই নভেম্বর এই মামলার শুনানীর দিন ধার্য করে যথাসময়ে কোর্ট থেকে নোটিশ জারী করা হল। মিঃ স্নেলসনকেও সেই দিন স্বয়ং হাইকোর্টে হাজির থাকতে আদেশ দেয়া হল।

জাস্টিস সাব্বির আহমদ এই মামলার বিচারের সময়ে যে তিনটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁর দীর্ঘ রায়ে তিনি তা প্রকাশ করেন। এর প্রথমটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ নজীর আহমদ পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারকেও একজন বিবাদী করার জন্যে আবেদন জানান, কোর্ট সেই আবেদন গ্রহণ করেন। যদিও এসব ক্ষেত্রে অভিযুক্ত অফিসারকে নিজেই মামলা চালাতে হয় এবং কেসের রায়ের উপরই ঠিক করা হয় সরকার সেই কর্মচারীকে মামলার খরচ দিবেন কিনা ; কিন্তু এখানে তার এক মাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল।

দ্বিতীয় অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন, যখন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকেও সহকারী অ্যাডভোকেট জেনারেল শুনানীর প্রথম দিন, অর্থাৎ ১৪ই নভেম্বর, এক আবেদন জানান যে প্রাদেশিক সরকারও এই মামলায় বিবাদী পক্ষ ভুক্ত হবে কিনা তা ঠিক করার জন্যে ৭ দিন সময় দেয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই সমস্ত মামলায় প্রাদেশিক সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল বা

Mamun Academy

সহকারী অ্যাডভোকেট জেনারেলই কোর্টের পক্ষ থেকে মামলা পরিচালনা করেন, কারণ হাইকোর্ট সরকারেরই একটি অঙ্গ এবং কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার অবমাননা (সে যত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিই হোক না কেন) সরকারের অবমাননারই সামিল।

প্রাদেশিক সরকারের মুলতুবীর আবেদন কোর্ট আগ্রাহ্য করেন এই কারণে যে প্রাদেশিক সরকার এর আগেই নোটিশ পেয়ে তার মত স্থির করার প্রচুর সময় পেয়েছিল।

এই ভাবে সরকারী অ্যাডভোকেটের সহযোগিতা না পাওয়ায় কোর্ট তাদের পক্ষ থেকে মামলা পরিচালনার জন্যে আদালতের বন্ধু (Amicus curial) হিসেবে বিখ্যাত অ্যাডভোকেট মিঃ মাহমুদ আলী কাশুরীকে নিযুক্ত করেন।

বিচারকের মতে এই মামলার তৃতীয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দাখিল করা লিখিত বিবরণের বিষয়বস্তু। এর প্রথম ও দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের বাংলা তরজমা দেয়া প্রয়োজন:

১। 'পাকিস্তান সরকারের ল' সেক্রেটারী স্যার এডওয়ার্ড স্নেলসন, কে. বি. ই. (বিবাদী) ওই বক্তৃতাটি প্রদান করেন (আপত্তিকর সেই দুইটি প্যারাগ্রাফ সহ) তাঁর সরকারী কর্তব্যের অংশ হিসেবে রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থানরত কেন্দ্রীয় সরকারের সেকশন অফিসারদের নিকট। এই বক্তৃতা সম্পূর্ণই সরকারী কর্মচারীদের জন্যে দেয়া। এবং ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয় আইন অনুসারে এর কোন অংশ বাইরে প্রচার নিষিদ্ধ। পরবর্তী কালে এর কপি ছাপানো হয় এবং এই কপি রুটিন মাফিক কেবলমাত্র সরকারের কয়েকজন কর্মচারীর নিকটই পাঠানো হয়।'

Mamun Academy

২। 'যে সকল অফিসারের নিকট ওই কপি পাঠানো হয় বা যাঁদের নিকট বক্তৃতা করা হয় তাঁদের কেউই আইনতঃ তার বিষয়বস্তু সাধারণ্যে প্রকাশ করতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকার যতদূর জানতে পেরেছে তাতে দেখা যায় যে বাইরের জনসাধারণ এই বক্তৃতার বিষয়বস্তু কেবল তখনই জেনেছে যখন কোর্টের নোটিশের সঙ্গে বক্তৃতার অংশও স্যার এডওয়ার্ড স্নেলসানের নিকট পাঠানো হয়, আর তখনই মাত্র তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

স্বাক্ষর/নজীর আহমদ খান।

এটর্নী জেনারেল অফ পাকিস্তান।

সরকারের উপরোক্ত বিবরণ সম্বন্ধে জাস্টিস সাব্বির আহমদ ও জাস্টিস ইয়াকুব আলী উভয়ই তাঁদের রায়ে তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে তা দ্বারা সরকার বিচারকদের হীন ভাবে ভয় প্রদর্শন করেছেন এই বলে যে বিচারপতিরাই এই মামলা শুরু করেছেন ও নোটিশ দিয়ে সরকারী গোপনীয়তার আইনভঙ্গ করেছেন। তাই তাঁরাও আইনত দণ্ডনীয়। মাননীয় জজদের মতে এ ক্ষেত্রে যেন 'ডিমোক্লিসের তরবারী' ঝুলছিল মামলার বিচারকদের মাথার উপর। এবং (এ দ্বারা বলা হয়েছে) এই মামলার বিচারের সময় বিচারকদের সাবধান হওয়া উচিত যেন তাঁরা নিজেরাই আইন আমলে না আসেন। মিঃ সাব্বির আহমদ বলেন যে, পৃথিবীর সভ্য জগতের ইতিহাসে বোধহয় আগে কখনও দেখা যায়নি যে একটি কোর্টকে— তা সে যত ছোটই হোক না কেন—তার বিচার কার্যে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে। বিশেষ ভাবে যখন সরকার এই মামলায় অন্যতম একপক্ষ। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তির নির্দেশে কোর্টে এই বিবরণ

দাখিল করা হয়েছে, দেশের আদালত ও তার বিচারের প্রতি সেই ব্যক্তির বিন্দুমাত্রও আস্থা নেই। সেটাও কোর্টের প্রতি অবমাননার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কোন্ সে ব্যক্তির আদেশ বা নির্দেশে কোর্টের প্রতি এহেন হুমকি স্বরূপ বিবরণ কোর্টের কাছেই দাখিল করা হয়েছে? তারনাম প্রকাশ করতে এটর্নী জেনারেলের নিকট কোর্ট বারবার বলা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে জাস্টিস সাব্বির আহমদ বলেন যে কোর্টের প্রতি এহেন অবমাননার আর একটি মাত্র ইতিহাস তাঁর জানা আছে।

ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরী তখন যুবরাজ ও সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তাঁর পিতার রাজত্বকালে তাঁর একজন অতি প্রিয় ভৃত্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী হলে বিচারের জন্যে তাকে রাজার প্রধান বিচারপতি লর্ড গস-কোইগনির সম্মুখে হাজির করা হয়। এই সংবাদ পেয়ে যুবরাজ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে সেই আদালতে হাজির হন ও তাঁর প্রিয় ভৃত্যকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিতে কোর্টের সবার প্রতি আদেশ দিতে থাকেন। তিনি কোর্টের সবাইকে গালি-গালাজও করেন। তখন প্রধান বিচারপতি তাঁকে জানান যে তাঁর ভৃত্য কোর্টের নিকট বিচারের আসামী। দেশের সু প্রাচীন আইন অনুসারেই তার বিচার হবে। এ বিচারে বাধা দেয়া চলবে না। তবে সাজা দেয়ার পরে যুবরাজ ইচ্ছা করলে তাঁর পিতা ইংলণ্ডের রাজার দ্বারা সেই শাস্তি মাফ করিয়ে নিতে পারেন।

বিচারকের এই উক্তিতে যুবরাজ সন্তুষ্ট না হয়ে আরও ক্রোধান্বিত হয়ে এগিয়ে এসে জোর করে কোর্টের আওতা থেকে আসামীকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। বিচারক তখন কোর্টের সম্মান অক্ষুণ্ণ

রাখার জন্যে যুবরাজকে আদেশ করলেন, আসামীকে ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ কোর্ট ত্যাগ করতে। কিন্তু যুবরাজ সে কথায় কর্ণপাত না করলে বিচারক তাঁর বিচারসনে বসে দৃঢ়কণ্ঠে এই রায় উচ্চারণ করলেন : জনাব, মনে রাখবেন যে আমি এই আসনে বসে আপনার সার্বভৌম পিতার নামেই বিচার কার্য সমাধা করি। আপনার উচ্ছৃঙ্খলতায় রাজার নামে আজ আপনাকে আমি সাজা দিতে বাধ্য হচ্ছি, যা ভবিষ্যতের জন্যে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, যেন আর কেউ কখনও আদালতের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। আমি আপনাকে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী করে জেলে পাঠাচ্ছি এবং আপনার পিতা যতদিন আপনাকে সেখানে থাকতে বলেন ততদিন আপনাকে জেলে থাকতে হবে।'

এই রায়ের পরে রাজার কর্মচারীরা দৌড়ে গিয়ে রাজার আদরের একমাত্র পুত্র যুবরাজের বিরুদ্ধে এহেন শাস্তির কথা তাঁর কাছে নালিশ করল আর ভাবল যে রাজা না জানি এরপর বিচারককে কি শাস্তিই দেন।

কিন্তু সব ঘটনা শুনে রাজা আনন্দে ঈশ্বরের প্রতি দুহাত উঠিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'হে দয়ালু ঈশ্বর, আমি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে কি মহা সৌভাগ্যবান। বিশেষ করে এই কারণে যে তুমি আমাকে এহেন একজন বিচারক দিয়েছ যিনি বিচার কার্যে মোটেও ভয় পান না এবং এরকম সন্তানও আমাকে দিয়েছ যে বিচারের ঐ রায় মেনে সাজা ভোগ করবে।'

এই উদাহরণ দিয়ে জাস্টিস আহমদ বলেন, লর্ড চীফ জাস্টিস গস-কোইগনির মত এই বিচারপতিও সেই শক্তিশালী কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করত যদি এটর্নী জেনারেল তাঁর নাম প্রকাশ

Mamun Academy

করতেন এবং সেই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ওই রাজার মত রাষ্ট্র প্রধানের আশিবাদও লাভ করত।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে আমি যতবারই এটর্নী জেনারেলকে বলেছি যে আইনত তিনি কোর্টের নিকট ও রকম (অপমানকর) জবাব দাখিল করতে পারেন না, এবং কে তাঁকে ওই জবাব দাখিলের উপদেশ দিয়েছেন তা যেন প্রকাশ করেন, প্রতিবারই তিনি জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে তা দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু এটা জানা কথা যে কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র কোন ব্যক্তির মারফতই কাজ করতে পারে, অন্য ভাবে নয়। এই উত্তর শুনে আমার মনে পড়েছিল আমার আইন জীবনের প্রারম্ভিক যুগে প্রায় ২৫ বৎসর আগেকার একটি কথা। তখন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মামলা পরিচালনা কালে কোর্টের পুলিশ অফিসার মাঝে মাঝে কোর্টকে উদ্দেশ্য করে সোজাসুজি বলে বসতেন যে তাঁর পুলিশ সুপার চান না যে এই আসামীর জামিন দেয়া হয় বা কোন হোমরা-চোমড়া ব্যক্তির এমন ইচ্ছা নয় যে এই আসামী বিচারে মুক্তি পায়।

এই সঙ্গে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে সরকার পক্ষ যখন কোন কোর্টে একটি পক্ষ হিসেবে হাজির হয় তখন সেই কোর্ট যত নিম্ন কোর্টই হোক না কেন এবং বিপক্ষ যত দুর্বল বা দরিদ্রই হোক না কেন, কোর্টের নিকট উভয় পক্ষই সমান এবং সরকার পক্ষ কোন বিশেষ অধিকার বা প্রধান্য কোন মতেই পেতে পারে না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে উক্ত বক্তৃতার প্রকৃত বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার ৯ ও ১০ নম্বর প্যারার কোন সম্বন্ধই নেই। কিন্তু তবুও সরকারী খরচে সেটার ২,০০০ কপি ছাপানো হয় আর সেগুলো অফিসারদের কাছে এবং দপ্তরে দপ্তরে বিতরণও

করা হয় ; অথচ উদ্যোক্তারা কেউই এটা লক্ষ্য করেননি যে দেশের হাইকোর্টকে কিভাবে অন্যায় আক্রমণ করা হয়েছে ওই দুই প্যারাগ্রাফে।

বিচারকেরা নিজেদের ব্যাপারে নিজেরাই বিচারে বসতে সর্বদাই ঘৃণা করেন কিন্তু তবুও আদালতের সম্মানার্থে ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই ব্যবস্থা হাইকোর্টকে নিতে হয়েছে। সরকারের অন্যান্য দপ্তরের কর্মচারীদের মত জজেরাও নিজেদের এবং কোর্টের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের কাছ থেকে সমান ভাবে আশা করতে পারেন।

মিঃ স্নেলসনের বক্তৃতার আলোচ্য উক্ত দুইটি প্যারাগ্রাফে যে-রকম অবান্তরভাবে হাইকোর্টকে আলোচনায় টেনে আনা হয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বিবাদী তাঁর শ্রোতাদের বুঝাতে চেয়েছিলেন যে পাকিস্তানের হাইকোর্ট এমন কিছুসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠন করা হয়েছে যাঁরা রীট আইনটি বুঝতে পারেননি অথচ সেই আইন তাঁরা প্রয়োগ করে আসছিলেন গত ৫ বৎসর যাবত।

ওই বক্তৃতার ফলে শ্রোতাদের ও পাঠকদের মনে এই ধারণাই হতে বাধ্য যে হাইকোর্টের লোকেরা হয় আইন বোঝেন না নতুবা তাঁরা ইচ্ছা করে আইনের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন।

এই মামলার শুনানীর দিনে অর্থাৎ ১৪ই নভেম্বর তারিখে বিবাদী কোর্টে হাজির হলে কোর্টের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ স্নেলসন বলেন যে তাঁর বক্তৃতার ৯ নং প্যারাতে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে সরকারের বিরুদ্ধে রীট আদেশ জারী করার অধিকার হাইকোর্টের নেই। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে ১৭০ নং ধারা অনুসারে হাইকোর্টকে রীট জারী করার যে অধিকার দেয়া

Mamun Academy

হয়েছে, সুপ্রীম কোর্টের কোন রায়ে তা অস্বীকার করা হয়েছে বলে তাঁর জানা আছে কিনা। উত্তরে মিঃ নেলসন জানান যে এ রকম কোন রায়ের কথা তাঁর জানা নেই।

তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ও সত্যতা সম্বন্ধে কোর্টথেকে তাঁকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু কোনটিরই তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে হাইকোর্ট সম্বন্ধে আলোচনার সময় তিনি কি আরও ভদ্র ভাষা ব্যবহার করতে পারতেন না? উত্তরে বিবাদী জানান যে গুরুতর সরকারী কাজের চাপের মধ্যে থেকে অতি অল্প সময়ে তাঁকে বক্তৃতা প্রস্তুত করতে হয়েছিল। আরও অধিক সময় পেলে তিনি হয়ত তাঁর ভাষা পরিবর্তন করতে পারতেন। তবে তাঁর মতে ভাষায় কোথাও হাইকোর্টকে হেয় করা হয়নি।

অতঃপর মাননীয় বিচারপতি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের ১৭০ নং ধারা উল্লেখ করেন। উক্ত ধারার বাংলা অনুবাদ এই:

'১৭০ (শাসনতন্ত্রের) ২২নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন হাইকোর্ট তাহাদের নিজ নিজ এলাকাধীনে সমস্ত লোক, অথরিটি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আদেশ, নির্দেশ, রীট, হেবিয়াস কর্পাস, কো-ওয়ারেন্টো ইত্যাদি জারী করিয়া ঐ কোর্টকে শাসনতন্ত্রের ২নং বিভাগে যে সমস্ত অধিকার দেয়া হইয়াছে তাহা বা অন্য কোনও আদেশ বা অধিকার এনফোর্স বা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।'

বিচাপতি বলেন:—

শাসনতন্ত্রের ওই ১৭০ ধারা যে কেউ মাত্র একবার পাঠ করেছে সেকি একথা কখনও বলতে পারে যে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে রীট জারী করার অধিকার হাইকোর্টের নেই?

Mamun Academy

বিবাদী একজন উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ যিনি বহু বৎসর যাবত কেন্দ্রীয় সরকারের ল' সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করে আসছেন। তাইএ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না যে তিনি এই ১৭০ ধারার সঠিক অর্থ বুঝতে পারেননি এ ছাড়া সুপ্রীম কোর্টের এমন কোন রায়ওবিবাদী দেখাতে পারেননি যা দ্বারা হাইকোর্টকে দেয়া শাসনতন্ত্রের এই অধিকার কোথাও অস্বীকার করা হয়েছে। এই ব্যাপারেও বিবাদীর বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কেবল এখানেই শেষ নয়—বিবাদী তাঁর সমগ্র বক্তৃতায়। সরকারের সমস্ত বিভাগের মধ্যে কেবলমাত্র বিচার বিভাগীয় হাইকোর্টকেই দোষী করেছেন দেশে অরাজকতা, বিবাদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি সমস্ত অনর্থের মূল হিসেবে। সরকারের আর কোন অঙ্গের বিরুদ্ধে এরকম আক্রমণ করা হয়নি।

বক্তৃতার ২০ নং প্যারায় 'সরকার বনাম এ. আর. আজারের মামলা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা-ও মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে হাইকোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে সরকার সুপ্রীম কোর্টে ১৯৫৭ সালের ৭ নং আপীল দায়ের করেন এবং উক্ত আপীল ৭. ৩. ৫৮ তারিখে ডিসমিস হয়ে যায়। অতঃপর সেই কেসে কোন আপীল করা হয়নি। এই অসত্য উক্তি করে বিবাদী হাইকোর্টের উপর অতি অন্যায় আক্রমণ করেছেন।

বিবাদীর মাতৃভাষা ইংরেজী, তাই এ-ও বলা তাঁর পক্ষে চলে না যে তিনি তাড়াহুড়া করে বা ভাষাজ্ঞানের অভাবে সঠিক ভাষা ব্যবহার করতে পারেননি; বরং এইটাই বোঝা যায় যে বিবাদী ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথমে শ্রোতা ও পরে বিবৃতির পাঠকদের নিকট হাইকোর্টকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। এটাও বিবাদী স্বীকার করেছেন যে তাঁর অনুমতি নিয়েই উক্ত বক্তৃতার ২,০০০

Mamun Academy

কপি ছাপানো ও বিতরণ করা হয়েছিল।

'বিবাদী সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সেই বক্তৃতা করেছেন, অতএব তিনি এর জন্যে দায়ী নন' বিবাদীর এই বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিবাদী তাঁর বক্তৃতায় দেশের আইন ভঙ্গ করে পুনরায় সরকারেরই ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে পারেন না।

অবশ্য ল' সেক্রেটারী হিসেবে বিবাদী হাইকোর্টের কোন জজ সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের নিকট বা স্বয়ং প্রেসিডেন্টের নিকট গোপনীয় চিঠির মারফত যে-কোন অভিযোগ আনার অধিকারী, কিন্তু তিনি সরকারী কর্মচারীদের নিকট এহেন মিথ্যা ও অপমানকর বক্তৃতা দিয়ে ও পরে তা আবার ছাপিয়ে বিতরণ করিয়ে পাকিস্তানের আইন অনুসারে কোর্ট অবমাননার দায়ে অবশ্যই দোষী।

এখন দেখা যাচ্ছে যে বিবাদী তাঁর অসত্য ও অবমানকর উক্তিসমূহ দ্বারা দেশের শাসনতন্ত্রের এমন একটি প্রধান অঙ্গকে জঘন্যভাবে আক্রমণ করেছেন যার উপর দেশের আপামর জনগণের অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকা উচিত। একজন ব্যক্তির খামখেয়ালীর কাছে একটি প্রতিষ্ঠান বলি দেয়া যায় না। বিবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের ল' সেক্রেটারী হিসেবে অতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতা ও পাঠকবর্গ স্বভাবতই মনে করবে যে তিনি দেশের আইন সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য।

নবীন সরকারী কর্মচারীরা এই বক্তৃতা তাদের পাঠ্য হিসেবে ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় ভালভাবে পড়বেন অথচ প্রকৃত তথ্য তাঁরা জানবার সুযোগ পাবেন না।

তাই এই মামলায় বিবাদী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তিনি আদালত অবমাননার আইনের আওতায় সর্বোচ্চ শাস্তিই পাওয়ার যোগ্য।

Mamun Academy

কিন্তু যেহেতু বিবাদী একজন বিদেশী ইংরেজ ও তিনি গত ১২ বৎসর যাবত এদেশে চাকরিরত আছেন, তাই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে দুই হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। এ ছাড়া তাঁকে আরও আদেশ দেয়া হল যে কোর্টকে সাহায্যকারী অ্যাডভোকেট মিঃ মাহমুদ আলীকে তিনি ২০০০-টাকা খরচাও দেবেন।

জাস্টিস সাব্বির আহমদ এই ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। হাইকোর্টের সেই বেঞ্চের অপর দুজন বিচারক জাস্টিস আচিসন এবং জাস্টিস ইয়াকুব আলীও উপরোক্ত রায়ের সঙ্গে একমত হন। তবে তাঁরা দুজনেও আলাদা আলাদা ভাবে রায় লেখেন ও ঘোষণা করেন যে বিবাদী দেশের উচ্চ আদালত হাইকোর্ট সম্বন্ধে অবান্তর মিথ্যা উক্তি ও হীন ভাষা প্রয়োগ করে আদালত অবমাননার দোষে দোষী প্রমাণিত হয়েছেন। বিবাদীকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁরা দুজন একমত হন।

এই মামলার রায় বেরুবার পর স্বভাবতই বিবাদী মিঃ স্নেলসন ও কেন্দ্রীয় সরকার পক্ষ, হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল দাখিল করেন। তাঁরা সেই আপীলে জাস্টিস সাব্বির আহমদের রায়ের কয়েকটি কড়া উক্তিও তাঁর রায় থেকে বাদ দেবার আবেদন করেন।

সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন চীফ জাস্টিস মিঃ এ. আর. কর্ণেলিয়াস সহ মোট ৫ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত বেঞ্চের ঢাকা অধিবেশনে এই আপীলের শুনানী হয়। অন্যান্য বিচারপতিগণ ছিলেন বিচারপতি এস. এ. রহমান, বিচারপতি ফজলে আকবর, বিচারপতি বি. জেড. কায়কাউস. এবং বিচারপতি হামিদুর রহমান।

Mamun Academy

পাঁচজন বিচারপতিই তাঁদের পৃথক পৃথক রায়ে সেই আপীল অগ্রাহ্য করে মিঃ স্নেলসনকে আদালত অবমাননার দোষে দোষী সাব্যস্ত করেন।

প্রধান বিচারপতি কর্ণেলিয়াস তাঁর রায়ে বলেন যে, হাই-কোর্টের উচিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারকে এই মামলায় পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন মঞ্জুর করা।

তিনি আরও বলেন, 'পৃথিবীর সব সভ্য দেশেই সমস্ত উচ্চ আদালত-গুলোকে নিজেদের বিরুদ্ধে অবমাননার বিচারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এই জন্যে যে, দেশের আপামর জনসাধারণ যেন আদালতের উপর আস্থা হারিয়ে না ফেলে এবং কোন ব্যক্তি বা সংস্থা, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, যেন আদালতের সম্মানে আঘাত না হানতে পারে। এটাও সমস্ত সভ্য জগতের প্রচলিত রেওয়াজ যে কোন আদালত যদি কারও কাজে বা কথায় নিজেকে অপমানিত মনে করে, তখনই বিনা তর্কে সেই ব্যক্তির উচিত আদালতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এমন-কি যদি সত্যিই কোন অবমানকর কিছু নাও বলা হয়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোড়ার দিকে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আদালত তা সাধারণতঃ গ্রহণ করে থাকে। মাননীয় চীফ জাস্টিস বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'কিন্তু এক্ষেত্রে এই প্রচলিত নিয়মের মারাত্মক ব্যতিক্রম দেখা গেছে। বিবাদী কোর্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেননি বা অনুতপ্তও হন নি। কেবলমাত্র শেষের দিকে সুপ্রীম কোর্টে এসে কেন্দ্রীয় সর-কারের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু এ অবস্থায় তাও গ্রহণযোগ্য নয়। বিবাদী হাইকোর্ট সম্বন্ধে কতগুলো গুরুতর ও মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। সুপ্রীম কোর্ট উল্লিখিত প্রতিটি কেসের আপীলের শুনানীর সময়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসেবে তাঁর

দের সূত্রপাত করেছেন। তাই তাঁর বক্তৃতা দ্বারা উল্লিখিত বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টির জন্যে হাইকোর্ট নয় বরং ল' সেক্রেটারীই দায়ী।'

মাননীয় জাস্টিস হামিদুর রহমান তাঁর রায়ে বলেন, 'আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে সরকারের এই বিভাগের প্রধান একজিকিউটিভ কর্মকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব। বিশেষ করে যখন এই বিভাগ দেশে আইন বিভাগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমার বিশ্বাস ছিল যে সরকারের সকল কর্মচারীদের মধ্যে তিনিই (ল' সেক্রেটারী) বরং সবচেয়ে ভাল জানবেন যে দেশের আইন হল তাই যা উচ্চ আদালত ব্যাখ্যা করেন। তাঁর (ল' সেক্রেটারীর) পক্ষে বরং শৃঙ্খলার খাতিরে সেই ব্যাখ্যা অবিচল ভাবে মেনে নেয়াই উচিত ছিল—যতক্ষণ না আরও উচ্চ আদালত সেই ব্যাখ্যা ভুল বলে ঘোষণা করেন বা যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশের আইন সভা সেই আইন পরিবর্তন করেন। অন্যথায় দেশের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য সে আইন বা ব্যাখ্যা মেনে চলা। আমি আশ্চর্য হয়েছি এই দেখে যে ল' সেক্রেটারী এই সত্য তাঁর সেকশন অফিসারদের বুঝিয়ে দেয়া সঙ্গত মনে করেননি। প্রশাসন বিভাগের মত বিচার বিভাগও দেশের একটি প্রধান অঙ্গ। আর দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরে প্রতিটি অঙ্গেরই উচিত অপর বিভাগের প্রাপ্য উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দেয়া।'

সুপ্রীম কোর্টের সকল জজেরাই সেই আপীল ডিসমিস করে হাইকোর্টের রায় সম্পূর্ণ বহাল রাখেন।

ঢাকাতে সুপ্রীম কোর্টের এই চাঞ্চল্যকর মামলা চলাকালীন তৎকালীন সরকারের একরোখা ভাব লক্ষ্য করে একদিন সাংবাদিকেরা তৎকালীন আইন মন্ত্রী জাস্টিস ইব্রাহীমকে (যিনি এককালে হাইকোর্টের জজ ছিলেন) প্রশ্ন করেছিলেন যে যদি ল' সেক্রেটারী সুপ্রীম-কোর্টে

Mamun Academy

পরাজিত হন তবে তাঁর সে শাস্তি মেনে নেয়া হবে কিনা। আইন মন্ত্রী উত্তরে জানিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই দেশের সর্বোচ্চ কোর্টের রায়ের উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া হবে।

সরকার সুপ্রীম কোর্টের রায়ের সে মর্যাদা দিয়েছিল এবং ওই রায়ের পরে মিঃ নেলসনকে চাকরি থেকে বিদায় নিয়ে জরিমানার টাকা জমা দিয়ে পাকিস্তান ছেড়ে ইংলণ্ডে পাড়ি জমাতে হয়েছিল।

তৎকালীন ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, সেখানে গিয়ে মিঃ নেলসন এক বিবৃতিতে বলার চেষ্টা করেন যে পাকিস্তানের মত কমনওয়েলথভুক্ত একটি দেশ তাঁকে অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য এর উত্তর পাকিস্তানের কাউকে দিতে হয়নি। ইংলণ্ডেরই একটি প্রধান সংবাদপত্র মিঃ নেলসনকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল যে, মিঃ নেলসন একজন ব্রিটিশ নাগরিক হয়ে হাইকোর্টের মত একটি মহান প্রতিষ্ঠানকে অবমাননার দায়ে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, এটা কেবল তাঁর পক্ষেই নয় বরং সমগ্র ব্রিটিশ জাতির পক্ষেই এক মহা কলঙ্ক। ইংরেজরা আদালতকে সবসময় সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে থাকে। তাঁর এই হীন কাজের পেছনে কোন ব্রিটিশ নাগরিকেরই সমর্থন নেই ও থাকতে পারে না। তিনি ইংরেজদেরও ঘৃণার পাত্র।

জামাল হক হত্যা মামলা

Mamun Academy

ঢাকার মতিঝিল স্টেট ব্যাঙ্ক কলোনীর ১৬নং বিল্ডিং এর ফ্ল্যাটের অধিবাসীদের সে রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল এক বিচিত্র শব্দে। সেটা ছিল ১৯৬৯ সালের ২৬শে মে দিবাগত রাত্র। একটি ভয়াবহ গোঁ গোঁ শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সবার কানে এল। মনে হল কে যেন মরণের আগে গভীর বেদনায় গোঙাচ্ছে। তখন রাত বারটা সাড়ে বারটা হবে। ওই কলোনীরই ভিন্ন ফ্ল্যাটের পড়শী শেখ মনিরুদ্দীন বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে কলোনীর মোজাহার আলী, আবদুল হালিম, জয়নাল আবেদীনও বেরিয়ে এসেছে তাদের ঘর থেকে। বোঝা গেল নিচ তলার জামাল হকের ফ্ল্যাট থেকেই আসছে সেই বিচিত্র গোঁ গোঁ শব্দ। বাড়ির কারও কোন বিপদ আপদ হয়ে থাকবে মনে করে তারা এগিয়ে গেল সেই ফ্ল্যাটের দিকে। দেখা গেল ভেতরে কোন বাতি জ্বলছে না। বাইরে থেকে তারা জামাল হকের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আরও এগিয়ে গিয়ে তারা দরজার কড়া নাড়তে শুরু করল। এবার ভেতর থেকে স্ত্রী কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল। তাদের প্রশ্নের উত্তরে দরজা না খুলেই ভেতর থেকে জামাল হকের স্ত্রী মারুফা বেগম কম্পিত কণ্ঠে জানাল যে

তাদের ফ্ল্যাটে কিছুই হয়নি।

'জামাল হক কোথায়? তাকে একটু ডেকে দিন,' বলল বাইরে থেকে একজন তার নিজ পরিচয় দিয়ে।

'তিনি এখন ঘরে ঘুমাচ্ছেন—ওঁর শরীর ভাল নয়।' দরজা না খুলেই ভেতর থেকে উত্তর দেয় মারুফা বেগম।

অগত্যা সকলে ফিরে গেল তাদের নিজ নিজ ঘরে।

এসে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল শেখ মনিরুদ্দীন ঠিক মনে নেই, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে আবার ঘুম ভেঙে গেল তার সেই রাত্রে। তখন রাত তিনটা হবে। দরজা খুলে বাইরে এসে মনিরুদ্দীন অবাক হয়ে দেখতে পেল জামাল হকের স্ত্রী মারুফা বেগম একলা দাঁড়িয়ে আছে তার দরজার সামনে ভীত সন্ত্রস্ত মুখে।

'কি ব্যাপার, এত রাতে আপনি এখানে?' প্রশ্ন করল মনিরুদ্দীন।

'আমাদের খুব বিপদ। আপনি দয়া করে একবার আসুন আমাদের ঘরে। আমার স্বামী দু'দুবার পাতলা পায়খানা ও বমি করে খুব নেতিয়ে পড়েছে।' শুনে ব্যস্ত হয়ে মনিরুদ্দীন এগিয়ে গেল জামাল হকের ফ্ল্যাটের দিকে। মারুফা তার পিছন পিছন আসতে লাগল। দেখল জামাল হকের ঘর অন্ধকার। মারুফাকে ভেতরে গিয়ে তাদের ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিতে বলল মনিরুদ্দীন। মাথা নেড়ে মারুফা বলল, 'আমাদের ঘরের বাল্‌ব্‌ নষ্ট হয়ে গেছে কয়দিন আগে, তবে অসুবিধা হবে না, রাস্তার বাতি থেকেই ঘরের ভেতরে প্রচুর আলো আসে তাতেই সব দেখা যায়। আপনি ভেতরে আসুন।'

ওদের বেডরুমে ঢুকে মনিরুদ্দীন দেখল জামাল হক তার খাটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তাকে উদ্দেশ্য করে মনির কয়েকবার ডাকল, 'জামাল ভাই! জামাল ভাই!' কিন্তু কোন সাড়াই এল না

ওর কাছ থেকে। কেমন যেন সন্দেহ হল মনিরের। সে আরও কাছে এসে জামালের গায়ে হাত দিয়ে তাকে মৃদু ধাক্কা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে। দেখল ওর শরীর শক্ত ও ঠাণ্ডা। বুঝতে পারল জামাল আর বেঁচে নাই।

মারুফার প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল, 'জামাল আগেই মারা গেছে।'

'এ-ও কি সম্ভব! মাত্র একবার পায়খানা ও দুবার বমি করেছে-ও। এতেই কি একজন সুস্থ সবল লোক মারা যেতে পারে?' কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল মারুফা মনিরের দিকে চেয়ে।

ঘরের চারদিকে একবার তাকাল মনিরুদ্দীন। দেখল জামাল ও মারুফার একমাত্র সন্তান তের বছরের বালক আক্তার হোসেন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে জামালের খাটের পাশে রাখা একটি চৌকিতে। আক্তারের প্রাইভেট মাস্টার বদিউজ্জামান গত কয় মাস যাবত ওই বাড়িতে লজিং থাকত। সে দুই রুমের মধ্যবর্তী দরজার কাছে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মধ্যে কোথাও বমি বা মলের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না মনির।

কোন কথা না বলে মনিরুদ্দীন বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাইরে এসে পার্শ্ববর্তী জয়নাল, হালিম, সালাম ও অন্যান্য সকলকে ডেকে জামালের মৃত্যু সংবাদ তাদের জানাল।

প্রায় ৪২ বৎসর বয়স্ক জামাল আগে সেনাবাহিনীতে কাজ করত। ঘটনার সময় সে ছিল তৎকালীন ঢাকা স্টেট ব্যাঙ্কের একজন পিওন। সেই ফ্ল্যাটেই সে গত কয়েক বৎসর যাবত তার স্ত্রী মারুফা বেগম ও আক্তার হোসেনকে নিয়ে বসবাস করছিল। সে বাড়িতে আরও এক যুবক গত কয়েক মাস থেকে বাস করছিল। তার নাম বদিউজ্জামান। সে ঢাকা কলেজে আই এ. পড়ত ও জামাল হকের বাসায় লজিং

থেকে আক্তারকে প্রাইভেট পড়াত। সে থাকত সেই ফ্ল্যাটেরই অন্য রুমটিতে।

জামাল হকের স্বগ্রামবাসী ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় দীন মোহাম্মদ থাকত মাইলখানেক দূরে রামকৃষ্ণ মিশন রোডে। ২৭শে মে ভোর পাঁচটায় সে খবর পেল যে জামাল হক হঠাৎ মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চলে এল সেই বাড়িতে। জামাল তখন চির নিদ্রায় নিদ্রিত তার বেডরুমের খাটের উপরে। দেখা গেল তার উপরের ঠোঁটের বেশ কিছুটা অংশ কাটা। সেখানে ও গালের দু'পাশে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। খাটের উপর কোন চাদর ছিল না। শুধু তোষকের উপরে শুয়ে ছিল সে। তোষকেও ছিল রক্তের দাগ। তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে। সেখানেও রক্ত জমে আছে, বাথরুমে গিয়ে দেখতে পেল একটি রক্তমাখা বিছানার চাদর বালতির মধ্যে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। দীন মোহাম্মদের প্রশ্নের উত্তরে মারুফা আগের মতই বলল যে হঠাৎ দাস্ত-বমির কারণেই তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। সে তখন পাকের ঘরের কাছে বসে কাঁদছিল। বদিউজ্জামানকে ঘিরে প্রশ্ন করছিল আশেপাশের কয়েকজন লোক।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সেখানে পুলিশ এসে গেল।

দীন মোহাম্মদই জামালের আত্মীয় হিসাবে পুলিশের নিকট এজাহার দিল। পুলিশ মৃতদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে তা ময়না তদন্তের জন্যে পাঠিয়ে দিল মর্গে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ রক্তমাখা বালিশ, তোষক, চাদর ও একটি বালতি মামলার আলামত হিসাবে নিজেদের হেফাজতে নিল। একজন পুলিশ ফটোগ্রাফার এসে ঘটনাস্থলের কতগুলো ফটো তুলে নিল। পুলিশ মেঝেতে পড়ে

থাকা কিছু জমাট রক্তও তুলে নিল। সেই সঙ্গে তখনই পুলিশ সন্দেহক্রমে বদিউজ্জামান ও মারুফা বেগমকে গ্রেপ্তার করল। প্রায় সকলেরই সন্দেহ হল যে, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।

পুলিশ তদন্ত শেষে আসামী বদিউজ্জামান ও মারুফা বেগমের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে চার্জশীট দাখিল করল।

ঢাকার তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা জজ মিঃ এ. জি. ভৌমিকের আদালতে চারজন এসেসরের সহযোগে এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার শুরু হয়।

এই রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের একমাত্র দেখা সাক্ষী ছিল জামাল হকের ১৩ বৎসর বয়স্ক পুত্র দাক্তার হোসেন। কোর্টে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সে জবানবন্দীতে বলে :

‘২৬শে মে রাত প্রায় দশটার সময়ে আমার পিতা-মাতার সঙ্গে আমি যথারীতি রাতের খাবার খাই। তারপর আমরা আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে যাই। আমার পিতা মাতা একটি খাটে আর তার পাশেই হাতখানেক দূরে আমি আমার চৌকিতে গিয়ে শুয়ে পড়ি। আমার মাস্টার বদিউজ্জামান শুতে গেল তার বাইরের ঘরে। প্রায় মধ্যরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল এক উচ্চ গোঙানির শব্দ শুনে। চেয়ে দেখি মাস্টার বদিউজ্জামান আমার পিতার মুখের মধ্যে জোর করে কাপড় গুঁজে দিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে সে জোরে বাবার গলা চেপে ধরেছে। একজন বিহারী লোক যাকে আমি আগে বদিউজ্জামানের সঙ্গে দেখেছি সে আমার বাবার পা দুটি শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে। দেখে আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। তাই শুনে আমার মাস্টার রেগে আমার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। তারপর সে আমাকে একটি ছোরা দেখিয়ে বলল যে আমি যদি

Mamun Academy

আবার চিৎকার করি তবে আমাকে সেই ছোরা দিয়ে খুন করা হবে। আমার মাও তখন আমাকে চুপ করে থাকতে বলল ও লোভ দেখাল যে আমি যদি শোরগোল না করি তবে সে আমাকে টাকা দেবে। তারপর মাস্টার বিহারী লোকটিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল আর মা রক্তমাখা বিছানার চাদর ধুতে লেগে গেল। এর আগে আমার পিতার বুড়া আঙ্গুলের নখ শুপারী কাটা যাঁতা দিয়ে তুলে ফেলা হয়েছিল। পিতার ঠোঁটে ছিল একটি ক্ষতের চিহ্ন। পরে সেই রাতেই বাইরে থেকে কয়েকজন লোক এসে বাবাকে ডাকলে মা দরজা না খুলেই ভেতর থেকে জানাল যে কিছুই হয়নি। খুনের বহু পরে মুনিরুদ্দীনকে নিয়ে আমার মা আবার ঘরে এল। মা তাকে বলল যে পায়খানা ও বমি করে তার পিতার মৃত্যু হয়েছে।'

আক্তার কোর্টকে আরও জানায় যে তার মাতা প্রায়ই তার পিতার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করত। আবার তার মা আসামী বদিউজ্জামানের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করত। এ-ও দেখা গেছে যে তারা উভয়ে একই প্লেটে খাবার খাচ্ছে। ঘটনার রাতে সে তার মাকে মৃত স্বামীর পায়ে তেল মালিশ করতে ও নকল কান্না কাঁদতে দেখেছে।

এই খুনের মামলায় আসামী ২০ বৎসরের যুবক বদিউজ্জামান ও ২৫ বৎসর বয়স্কা মারুফা বেগম আদালতের প্রশ্নের উত্তরে নিজেদের নির্দোষ বলে জানায়। অবশ্য তারা আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষী হাজির করেনি।

অবশ্য ঘটনার পরদিন উভয় আসামীকে ঢাকার এক ম্যাজিস্ট্রে-টের সামনে হাজির করলে সেখানে তারা দুজনে আলাদা ভাবে দুটি স্বীকারোক্তি করে যা ম্যাজিস্ট্রেট রেকর্ড করে নেন। আসামী বদিউজ্জামান তার স্বীকারোক্তিতে বলল: আমি মৃত ব্যক্তির বাড়িতে

লজিং থাকতাম। ঢাকা কলেজের আই. এ. শ্রেণীতে আমি পড়ি। গত সোমবার দিবাগত রাত্র অনুমান সাড়ে বারোটায় আমি ও মোঃ সাদেক নামক এক সিপাহী (যে প্রায়ই জামাল হকের সঙ্গে তাদের বাড়িতে আসত) আমরা একত্র মিলিত হই। সিপাহী সাদেক রাত্রে ঘরে ঢুকে জামাল হককে গলা টিপে মেরেছে। যখন জামাল হক মৃত্যুর সময় গোঙাচ্ছিল তখন আশেপাশের লোক এসে জিজ্ঞেস করলে মারুফা বেগম বলে যে তাহার ঘরে কিছুই হয়নি। অর্থাৎ জামাল হকের মৃত্যুর খবর অন্যকে জানতে দেয়নি। তার মৃত্যুর সময়ে আমি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি তাকে খুন করিনি। আসামী মারুফার সঙ্গে আমার প্রণয় ছিল। আমি মারুফার সঙ্গে প্রায় পনের দিন অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছি। আসামী মারুফা স্বেচ্ছায় তার দেহ আমাকে দান করেছে এবং আমিও সেই সুযোগ গ্রহণ করেছি। আমি কখনও বলপ্রয়োগ করিনি। যে মিলিটারী লোকটি তাকে গলা টিপে মেরেছে তাকে আমি দেখলে চিনতে পারব। তার মৃত্যুর পর মিলিটারী লোকটি সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেছে। সে ঘটনার আগে মারুফাকে বলেছে যে যদি লোকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তবে বলবে যে তার দুবার বমি হয়েছে ও বমির সঙ্গে রক্ত গেছে। তার হাত ও ঠোঁট সে নিজেই কামড়ে জখম করেছে।'

Mamun Academy

এদিকে ওই একই দিনে মারুফা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বলে: 'আসামী বদিউজ্জামানের সঙ্গে আমার স্বামীর টাকা-পয়সার লেন-দেন ছিল। পরে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। গত সোমবার দিবাগত রাত অনুমান সাড়ে বারটার সময়ে আসামী বদিউজ্জামান একজন মিলিটারী লোক সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে আসে। সেই মিলিটারী লোকটি আমার স্বামীকে গলা টিপে হত্যা করে। আমি

তৎক্ষণাৎ চিৎকার করি। আসামী জামান আমার স্বামীর দুই পা চেপে ধরে আর মিলিটারী লোকটি তাকে গলা টিপে খুন করে। আমি ভয়ে চিৎকার করলে সে আমাকে ছোরা দেখায়, ও আমার স্বামীকে খুন করে সে পালিয়ে যায়।' মারুফা তার স্বীকারোক্তিতে আরও বলে : 'আমার স্বামীর অগোচরে আসামী বদিউজ্জামানের সঙ্গে আমার প্রণয় জন্মে। আমি স্বেচ্ছায় তাকে আমার দেহ দান করেছি। আর আসামী জামানও আমার সঙ্গে অবৈধ সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে আমাকে উপভোগ করেছে। আমি নিজেই আমার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে জামানের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছি। একদিন অবশ্য জামান জোরপূর্বক আমার সঙ্গে কুকার্যে লিপ্ত হয়। সেদিন স্বামী টের পেয়ে জামানের বিছানা থেকে ধরে এনে আমাকে মার দেয়।' দুঃখের বিষয় এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক সিপাহী সাদেককে পুলিশ বহু চেষ্টা করেও গ্রেফতার করতে পারেনি। ঘটনার রাত থেকেই সে পলাতক হয়।

এই মামলায় বাদীপক্ষের মোট ১৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে একমাত্র দেখা সাক্ষী ছিল ছেলে আক্তার, যার চোখের সামনে নৃশংসভাবে গলা টিপে তার বাপকে তারই ঘরে হত্যা করা হয়। ডাক্তারের সাক্ষ্যতেও দেখা যায় যে মৃত জামালের গলায় দুটি আঙ্গুলের চাপের গভীর দাগ ছিল। আক্তার বয়সে নাবালক হলেও তার কাছে ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা অন্যান্য সাক্ষীদ্বারা ও ঘটনার পরম্পরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে আসামী পক্ষ থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে মৃত জামাল হকের সঙ্গে সেই বিহারী সাদেকের টাকা-পয়সা নিয়ে আগে থেকেই মনোমালিন্য ছিল। সেই সাদেকই শত্রুতার প্রতিশোধ

নেবার জন্যে ওই রাতে জামালকে খুন করে। এ প্রসঙ্গে সাদেকের লেখা বলে কথিত একটি বাংলা চিঠিরও অবতারণা আসামীপক্ষ করে। চিঠিটি ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়। তা হুবহু এই:

এক মিলিটারীর সঙ্গে জামাল হকের আসা যাওয়া উঠা-বসা আছে। জামাল হক সেই মিলিটারীর কাছ থেকে দুই হাজার টাকা নেয় সম্ভবত তিন মাস আগে। কয়েকবার মিলিটারীর সঙ্গে সাক্ষাত হয়, কিন্তু টাকার কথা বললে সে বলে এক সপ্তাহ ১৫ দিন পরে দেব। এই বলে ঘুরায়। অবশেষে আমি অর্থাৎ মিলিটারী পাওনাদার, তার থেকে টাকা আদায় করার জন্যে উপযুক্ত চেষ্টা করেছি। এমত অবস্থায় আমি স্বয়ং নিজে রাত্রের সুযোগ বুঝে রুমের মধ্যে ঢুকে তার উপর হামলা করার চেষ্টা করেছি। আমার হামলা পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আমার টাকার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। এর মধ্যে তার সংসার অথবা তার জানাশুনা কোন লোকের প্রলোভন অথবা যুক্তি পরামর্শ নাই। তারা সবাই নির্দোষী। আইনতঃ তাদের উপর কোনরকম হামলা চলবে না। সম্ভব হলে অপরাধীকে গ্রেফতার করার অনুরোধ করা হচ্ছে। এই শর্তে আমি নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে সই করলাম।'

তদন্তের সময় উক্ত চিঠি হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে উহা আসামী বদিউজ্জামানেরই লেখা। বিজ্ঞ সেশন জজ এই চিঠি বিশ্লেষণ করে দেখান যে চিঠির প্রথম অংশ একজন তৃতীয় ব্যক্তি লিখেছে বলে মনে হয়। অথচ এর শেষ অংশে মনে হয় যে মিলিটারী লোকটি নিজেই যেন চিঠিটি লিখেছে। চিঠির সইটাও উর্দুতে করা হয়েছে। বরং এই চিঠিই ভালভাবে প্রমাণ করে যে আসামী বদিউজ্জামান তার ও মারুফার দোষ ঢাকবার বিফল চেষ্টায় হত্যাকাণ্ডের পরে ওই চিঠি তৈরি করেছে। এটা দ্বারা প্রমাণ করার

বৃথা চেষ্টা করা হয় যে আসামী মারুফা ও বদিউজ্জামান নির্দোষ। এই হত্যাকাণ্ডে তাদের কোনই হাত ছিল না এবং মিলিটারী লোক-টিই সেই কাণ্ড করে। কিন্তু চিঠিটি পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যায় যেএটা দোষী বদিউজ্জামানেরই সৃষ্টি এবং এই চিঠি তার বিরুদ্ধে তারই দোষ প্রমাণ করে।

জামাল হকের বাথরূমে রক্তমাখা চাদর বালতিতে ভেজা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এতে বোঝা যায় যে ঘটনার পর আসামী মারুফা চাদরের রক্ত ধুয়ে হত্যার প্রমাণ নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল, এভাবে সে প্রকৃত ঘটনা গোপনের চেষ্টা করে। এতেও বোঝা যায় যে মারুফাও প্রত্যক্ষভাবে হত্যাকাণ্ডের সংগে জড়িত ছিল। ঘটনার রাত্রে পার্শ্ববর্তী লোকদের সংগে মারুফার বিচিত্র ব্যবহারও তার দোষই প্রমাণ করে।

বিচার শেষে চারজন এসেসরই একমত হয়ে আসামী বদিউ-জ্জামান ও মারুফা বেগমকে জামাল হককে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে। তাদের সংগে একমত হয়ে জজ সাহেব তাঁর রায়ের এক অংশে বলেন: 'সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও ঘটনা পরম্পরায় এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে জামাল হককে তার শয়ন কক্ষে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল। এ একটি সুপরিকল্পিত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের খুন যা সম্পন্ন করা হয়েছে তার নাবালক পুত্র শাক্তারের চোখের সামনে। সবকিছুতে এটা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে মারুফা বেগম তার প্রেমিক বদিউজ্জামানের সহযোগিতায় ও সেই মিলিটারীর সাহায্যে তাদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেই জামাল হককে ওভাবে খুন করেছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মারুফা ও বদিউজ্জামানের কামের ইন্ধন যোগানো ও অবৈধ প্রণয়ের পথ নিষ্কণ্টক করা। স্বামী ও স্ত্রীর পার-

স্পরিক সম্বন্ধ প্রেম, পরস্পর নির্ভরতা ও বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এদের মধ্যে একজনের বিশ্বাসঘাতকতা অন্য জনের পক্ষে চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে। এ ক্ষেত্রে একজন চরিত্রহীনা স্ত্রী, যার কাছে সততা ও মনুষ্যত্বের কোনই মূল্য নেই, সে তার নিজের অবৈধ কামক্ষুধা চরিতার্থের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য নিজ স্বামীকে পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধা করেনি।'

উভয় আসামীকে ৩০২/৩৪ দণ্ডবিধির ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করে রায়ে জজ সাহেব তাদের উভয়কেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীপক্ষ মহামান্য হাইকোর্টে আপীল করলে হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল থাকে।

তৎপর উভয় আসামী তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে আবেদন করে। গভর্নর শুধু মারুফা বেগমের আবেদন মঞ্জুর করে তাকে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেই সঙ্গে তিনি বদিউজ্জামানের প্রাণদণ্ড বহাল রাখেন।

তৎপর শেষ চেষ্টা হিসাবে বদিউজ্জামান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট-এর নিকট প্রাণ ভিক্ষা করে আবেদন করে। ইতিমধ্যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলা পাকিস্তানের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাধারণ ক্ষমার অঙ্গ হিসাবে তৎকালীন সব মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে দেন। সেই সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়ে আসামী বদিউজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত হয়।

—সমাপ্ত—

Mamun Academy